
ছোটদের
রামায়ণ



শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র

[আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিশু-সাহিত্যিক ও বিভিন্ন শিশু গ্রন্থ প্রণেতা]

রঞ্জন প্রকাশন
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

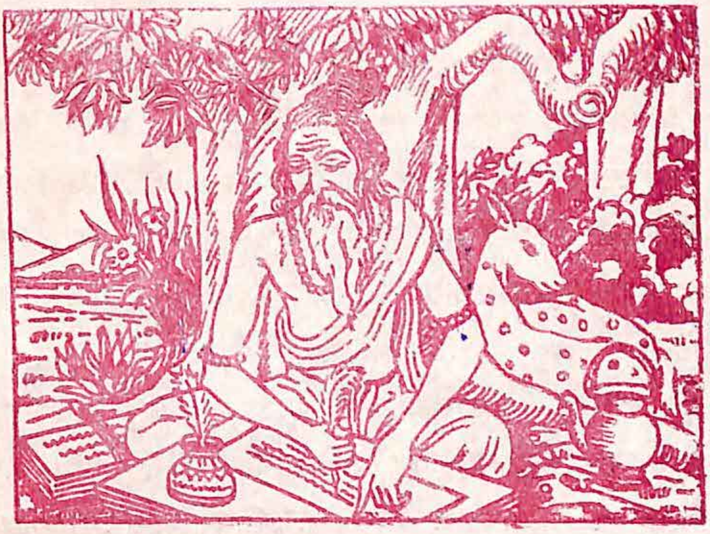
নবরূপে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ—ডিসেম্বর, ১৯৮৫

প্রকাশক ঃ
গোপাল চন্দ্র বল
রঞ্জন প্রকাশন

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ঃ
মৃণালকান্তি দাস

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
অশোক কুমার চৌধুরী
চৌধুরী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
পি-২১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬



ছোটদের রামায়ন

গোড়ার কথা

আমাদের বাঙলা ভাষায় যে রামায়ণ আমরা পড়ি, তাহা মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝার লেখা —কিন্তু আদি রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন মহর্ষি বাল্মীকি। মহর্ষি বাল্মীকির কিছু পরিচয় তোমাদের দেবো—

একদিন বনপথ ধরে চলেছেন দু'জন সন্ন্যাসী, ছদ্মবেশী ব্রহ্মা ও নারদ। হঠাৎ তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়াল এক দুর্দান্ত দস্যু—তার নাম রত্নাকর। মানুষ হত্যা করে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করে রত্নাকর নিজের পেট চালাত আর তার সংসারও চলত তাই থেকে। পথিক দু'জনের যা কিছু ছিল সব কিছু লুঠ করবার আশায় রত্নাকর মুগুর হাতে নিয়ে তাঁদের মারতে গেল। ব্রহ্মা তখন বললেন,—"তুমি যে দিনের পর দিন পাপ করে চলেছো, তোমার পরিণাম কী হবে তা ভেবে দেখেছ? এই সব পাপের ফল তোমাকে একা ভোগ করতে হবে।" রত্নাকর বলল,—"তা কেমন করে হয়? পরিবারের সকলেই তো আমার দস্যুবৃত্তির রোজগার থেকে খায়। তারা সবাই আমার পাপের ভাগী হবে।" ব্রহ্মা তখন হেসে বললেন,—"তোমার

পাপের ভাগ সংসারের কেউই নিতে রাজী হবে না। যদি বিশ্বাস না হয়, একবার সকলকে জিজ্ঞেস করেই এস।"

পথিকদের কথা শুনে তাঁদের হাত-পা বেঁধে রেখে রত্নাকর বাড়ি গিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, সত্যিই কেউ তার পাপের ভাগ নিতে রাজী নয়। তখন তার খুব ভয় হল। সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে পথিক দু'জনের বাঁধন খুলে দিল এবং ব্রহ্মার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল,—"আপনার কথাই সত্য ঠাকুর, এখন আমার উপায় কী হবে?" ব্রহ্মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"তুমি এখানে বসে এক মনে রামনাম জপ করো, সব পাপ হতে মুক্ত হবে।"

ব্রহ্মা ও নারদ চলে গেলেন। রত্নাকর বনের মধ্যে বসে এক মনে রামনাম জপ করতে লাগল ও এমনভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়ল যে, তার সমস্ত শরীর বল্মীক বা উইঢিপিতে ঢেকে গেল। বহুকাল পরে ব্রহ্মা ও নারদ এসে তাকে উইঢিপির ভিতর থেকে বের ক'রে বাল্মীকি বলে তার নতুন নামকরণ করলেন, আর রামের জীবনী নিয়ে রামায়ণ লিখতে বললেন। এমনি করে দস্যু রত্নাকর হল মহামুনি বাল্মীকি। বাল্মীকি আদর্শ চরিত্র রামকে নিয়ে সৃষ্টি করলেন সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

বাল্মীকি রচিত রামায়ণ বাঙলা ভাষায় পয়ার ছন্দে লেখেন কবি কৃত্তিবাস ওঝা। বাল্মীকির রামায়ণ অনুসরণ করে লিখিত হলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনেক স্থলে ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে।



আদিকাণ্ড

অনেক—অনেক বছর আগে অযোধ্যায় এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম দশরথ। তিনি যেমন বীর, তেমনি ছিলেন ধার্মিক ও দাতা। তাঁর রাজ্যে প্রজারা খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করত। তিনি তাদের নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন।

তাঁর রাজধানী আযোধ্যা নগর লম্বায় ছিল প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ, আর চওড়ায় ছিল দশ ক্রোশ তো বটেই। নগরটির একদিক দিয়ে বয়ে যেত সরযু নদী, আর তিনদিকে ছিল শক্ত, উঁচু প্রাচীর। তার বাইরে ছিল গভীর বন।

অযোধ্যা নগরের শোভাও ছিল বড় মনোরম। সেখানে ছিল সুন্দর সুন্দর বাড়ি, চমৎকার

বাগান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পথ-ঘাট। আর ছিল বড় বড় পুষ্করিণী, পুষ্করিণীতে পদ্মফুল, পথের ধারে ধারে ছায়াতরু। এমনি অনেক কিছু নগরের শোভা বাড়িয়ে তুলেছিল।

রাজা দশরথের তিন রাণী ছিলেন—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। তিন রাণীও যেমন ছিলেন রূপবতী, তেমনি ছিলেন গুণবতী। রাজা দশরথের কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল অভাব ছিল পুত্রের। এই জন্য তাঁর ও রাণীদের মনে সুখ ছিল না। প্রজারাও সেজন্য দুঃখিত ছিল।

রাজা সব সময় ভাবেন, তাঁর পর কে রাজা হবে! রাজার অভাবে দেশ কি অরাজক হয়ে উঠবে? তিনি ভেবে পান না, কী করবেন? দিনের পর দিন যায় এমনি ভাবেই। রাজার মনে দুঃখ বেড়েই চলে।

তখনকার দিনে মৃগয়া করতে যাওয়া ছিল বড় বড় রাজা-রাজড়াদের বিলাস। রাজারা পাত্র-মিত্রসহ মহাসমারোহে শিকার করতে যেতেন গভীর বনে। রাজা দশরথও প্রায়ই এরকম মৃগয়া করতে যেতেন। 'শব্দভেদী' বাণ চালনা করতে তিনি ছিলেন খুব নিপুণ। কোনো প্রাণী চোখে না দেখে, কেবলমাত্র তার শব্দ শুনে ঐ বাণ ছুড়তেন তিনি, আর তা ছিল একেবারে অব্যর্থ।

একদিন রাজা বনে গেলেন মৃগয়া করতে। সঙ্গে গেলেন পাত্র-মিত্র-সভাসদ্, আর গেল লোক-লশকর, অনেক হাতী-ঘোড়া। তিনি সারাদিন বনে বনে ঘুরে বেড়ালেন, কিন্তু শিকার আর মেলে না। শেষে রাজা ক্লান্ত হয়ে এক সরোবরের তীরে গাছের তলায় বিশ্রাম করতে বসলেন। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, দূরের জিনিস ভালো দেখা যায় না। এমন সময় রাজা একটা শব্দ শুনতে পেলেন—ঠিক যেন হরিণের জল পানের মতো সে শব্দ। মনে হল, কোনো হরিণ জল পান করতে এসেছে। তিনি না দেখেই দূর থেকে 'শব্দভেদী' বাণ ছুঁড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা করুণ আর্তনাদ তাঁর কানে এল। তিনি চমকে উঠলেন। তারপর শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেলেন তিনি। গিয়ে দেখেন, সে বাণ এক পরম সুন্দর মুনিকুমারের বুক ভেদ করে গিয়েছে। মুনিকুমারের নাম সিন্ধু, এই বনবাসী এক অন্ধ মুনি আর তাঁর অন্ধ পত্নীর একমাত্র পুত্র!

রাজা দশরথ সিন্ধুর মৃতদেহ কোলে নিয়ে অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে এসে দাঁড়ালেন তার অন্ধ পিতার কাছে। অন্ধ মুনি তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে কাতর হয়ে বিলাপ করতে

করতে দেহত্যাগ করলেন। মরবার সময় মুনি দশরথকে অভিশাপ দিলেন,—"আমি যেমন পুত্রশোকে প্রাণ দিচ্ছি আপনাকেও তেমনি পুত্রশোকে প্রাণ দিতে হবে।"

রাজা মাথা নীচু করে মুনিকে সবিনয়ে জানালেন,—"প্রভু, আমার তো কোনো পুত্র-সন্তান নেই, বোধহয় আপনার শাপ বৃথা হবে।"

কিন্তু মুনি-ঋষির অভিষাপ মিথ্যা হবার নয়। অন্ধ মুনি একটু থেমে বললেন,—"আপনি অপুত্রক সত্য, কিন্তু আমার অভিশাপও ব্যর্থ হবে না, মহারাজ রাপনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করুন, তা হ'লেই আপনার পুত্র হবে।"

মুনির অভিশাপই রাজা দশরথের কাছে শাপে বর হল। পুত্র না হলে তো আর পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করতে হবে না।

রাজা দশরথ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন



অন্ধমুনি রাজা দশরথকে অভিশাপ দিলেন।

বশিষ্ঠ মুনি। তিনি ছিলেন খুব জ্ঞানী। রাজার ুখে সব কথা শুনে তিনি খুশী হয়ে বললেন "খুব ভালো কথা মহারাজ! অন্ধমুনির কথামতো যজ্ঞ করায় আমাদের সকলেরই মত আছে।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবার আগে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হয়। এ কাজে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিই যোগ্য ব্যক্তি। আপনি তাঁকে আনিয়ে যজ্ঞ করুন।"

কুলপুরোহিত ও মন্ত্রীদের সম্মতি পেয়ে রাজা দশরথ খুব খুশী হলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি থাকতেন অনেক দূরে অঙ্গদেশে। তিনি ছিলেন লোমপাদ রাজার জামাতা। লোমপাদ রাজা ছিলেন রাজা দশরথের বন্ধু। উত্তরে রাজা দশরথ বশিষ্ঠ মুনিকে বললেন,—"এ তো খুব ভালো কথা। ঋষ্যশৃঙ্গ তো আমার বন্ধু লোমপাদ রাজার জামাই। আমি নিজেই তাঁকে আনতে যাব। ইতিমধ্যে আপনারা যজ্ঞের সব আয়োজন করে ফেলুন। সরযু নদীর তীরে যজ্ঞশালা তৈরী করান।"

রাজা দশরথের কথায় মন্ত্রিগণ যজ্ঞের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত হলেন। আর রাজা দশরথ গেলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনতে। যথাসময়ে যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও এসে পৌঁছলেন

সরযু নদীর তীরে বিরাট যজ্ঞশালার যজ্ঞ শুরু হ'ল। রাজা দশরথ বড় বড় রাজা, রাজকুমার, মুনি-ঋষি, পণ্ডিতদের দেশ-বিদেশে নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিলেন! তাঁরা সকলে যজ্ঞে এলেন। এঁরা ছাড়াও আরো যে কত অতিথি, প্রার্থী, ভিক্ষুক এল তার লেখা-জোখা নেই।

অশ্বমেধ যজ্ঞ করা যে-সে রাজার সাধ্য নয়! কিন্তু দশরথ তো ছোটখাটো রাজা ছিলেন না। তাই সকলকেই তিনি যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন ও দান-ধ্যান করলেন। খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ ও মণি-রত্ন দু'হাতে বিলিয়ে দিলেন। চারধারে সকলে তাঁকে 'ধন্য ধন্য' করতে লাগল। এক বছর ধরে যজ্ঞ চলল।

অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করে রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ শুরু করলেন। এই যজ্ঞেও পুরোহিত হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। রাজা দশরথ মহাধুমধাম করে যজ্ঞ করতে লাগলেন।

যজ্ঞের শেষে আহুতি দেওয়ার পর যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠলেন রক্তের মতো লাল কাপড় পরা এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। তাঁর হাতে সোনার থালা, থালায় পরমান্ন। সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ রাজা দশরথের হাতে পরমান্ন-ভরা সেই সোনার থালা দিয়ে বললেন,—"মহারাজ, স্বর্গ থেকে স্বয়ং ব্রহ্মা এই পরমান্ন পাঠিয়েছেন। আপনি তিন রাণীকে এই পরমান্ন খেতে দিন। তা' হলে আপনি পুত্রলাভ করবেন।

রাজা দশরথ সানন্দে পরমান্ন-ভরা থালা তাঁর হাত থেকে নিতেই তিনি অদৃশ্য হলেন।

রাজা দশরথ হাসিমুখে তখনি অন্তঃপুরে গিয়ে অর্ধেক পরমান্ন দিলেন কৌশল্যাকে, বাকি

অর্ধেক দিলেন কৈকেয়ীকে। তাঁদের ভাগ থেকে অর্ধেক করে দিতে বললেন রাণী সুমিত্রাকে। তখন তিন রাণী মহানন্দে সেই পরমান্ন ভাগ করে খেলেন। রাজারও যজ্ঞ শেষ হয়ে গেল। অতিথি-অভ্যাগতগণ নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

তারপর কয়েক মাস যেতে না যেতে তিন রাণীর চারটি পুত্র হ'ল। কৌশল্যার হ'ল একটি, কৈকেয়ীর একটি এবং রাণী সুমিত্রার দু'টি। রাজা-রাণীদের বহুদিনের মনঃকষ্ট দূর হ'ল। রাজবাড়িতে ও নগরে উৎসব শুরু হয়ে গেল।

না হবেই বা কেন? পুত্র চারটি হ'ল পরম সুন্দর। যে তাদের দেখে সে-ই মুগ্ধ হয়। রাজা-রাণীদের তো কথাই নেই।

তেরো দিনের দিন খুব ঘটা করে পুত্র চারটির নামকরণ করা হ'ল। কৌশল্যার ছেলেটি সকলের বড়—তার নাম রাখা হ'ল, রামচন্দ্র। কৈকেয়ীর ছেলেটি মেজো—তার নাম রাখা হ'ল, ভরত। আর, সুমিত্রার দুই ছেলের মধ্যে বড়টির নাম রাখা হ'ল লক্ষ্মণ; আর ছোটটির নাম রাখা হল শত্রুঘ্ন।

দিন যায়। চার রাজকুমার একটু একটু করে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। আর তাঁদের রূপ-গুণ চাঁদের কলার মতো প্রকাশ পেতে লাগল। চারটিতে খুব ভাব। তাঁদের মধ্যে আবার রাম-লক্ষ্মণে, আর ভরত-শত্রুঘ্নে ভাব হ'ল আরও বেশি। তাঁরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেন না।

বশিষ্ঠ মুনি ছিলেন খুব জ্ঞানী ও গুণী। রাজা তাঁর হাতে চার কুমারের শিক্ষার ভার দিলেন। মুনিও তাঁদের খুব যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিতে লাগলেন। চার কুমারই ছিলেন খুব মেধাবী। তাঁরা অল্পদিনেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন যে, তাঁদের সমান কাউকেই পাওয়া গেল না। কি লেখাপড়ায়, কি ধনুর্বিদ্যায়, এমন কি মল্লযুদ্ধে তাঁরা হলেন অদ্বিতীয়। তাঁদের মধ্যে আবার রূপে, গুণে, বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র। সকলের মুখেই তাঁদের সুখ্যাতি। তাতে রাজা দশরথের সুখের আর সীমা নেই।

সুখে দিন যায়। একদিন রাজা দশরথ পাত্র-মিত্র-সভাসদ্ নিয়ে রাজসভায় বসে আছেন। এমন সময়ে সেখানে বিশ্বামিত্র মুনি এলেন। রাজা তখনি আসন থেকে উঠে মুনিকে আদর-অভ্যর্থনা করে যথাযোগ্য আসনে বসালেন। মুনি রাজাকে আশীর্বাদ করে আসন গ্রহণ করলে রাজা দশরথ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,—"মুনিবর, কি মনে করে আপনার এখানে আসা

হয়েছে ? আমার প্রতি আপনার যদি কোন আদেশ থাকে বলুন। আমি তা পালন করে ধন্য হই।”



বশিষ্ঠমুনি কর্তৃক রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দান

বিশ্বামিত্র মুনি বললেন,—“মহারাজ, বড় বিপদে পড়েই এখানে এসেছি। আমাদের তপোবনে রাক্ষসদের বড় অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে! আমাদের যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হবার মতো অবস্থা হয়েছে। আমরা যজ্ঞ আরম্ভ করলেই ‘মারীচ’ আর ‘সুবাহু’ নামে দু’টি রাক্ষস এসে যজ্ঞস্থলে হাড়, মাংস ছুঁড়ে দিয়ে আমাদের যজ্ঞ পণ্ড করে। তাই আপনার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছি। আপনি রামকে আমার সঙ্গে দিন। রাম রাক্ষসদের বধ করে আমাদের তপোবনে শান্তি ফিরিয়ে আনবে। আমরা নির্বিঘ্নে যজ্ঞ করতে পারব।”

মুনির কথা শুনে ভয়ে দশরথের প্রাণ-কেঁপে উঠল। তিনি তো মহা ভাবনায় পড়লেন। রাম কিশোর মাত্র। তিনি কী করে অমন দুরন্ত রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বধ করবেন? কিন্তু ভেবে-চিন্তে কোন উপায়ও ঠিক করতে পারলেন না। যখন মুনির আদেশ পালন করবেন বলে কথা দিয়েছেন তখন তা রাখতেই হবে। না রাখলে অধর্ম তো হবেই, তার ওপর বিশ্বামিত্র মুনি মানুষটি ভারি রাগী। এখনি হয়তো শাপ দিয়ে সব ভস্ম করে

ফেলবেন। কাজেই রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে রামকে পাঠালেন। রামের সঙ্গে লক্ষ্মণ গেলেন।

নগরের চারধারে ছিল গভীর বন। সরযূ নদী পার হয়ে বনপথে খানিক দূর গিয়ে বিশ্বামিত্র মুনি রামকে 'বলা' আর 'অতিবলা' নামে দু'টি মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। এই দু'টি মন্ত্রের বলে রামের শরীরে শক্তি বাড়ল, তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করতে শিখলেন।

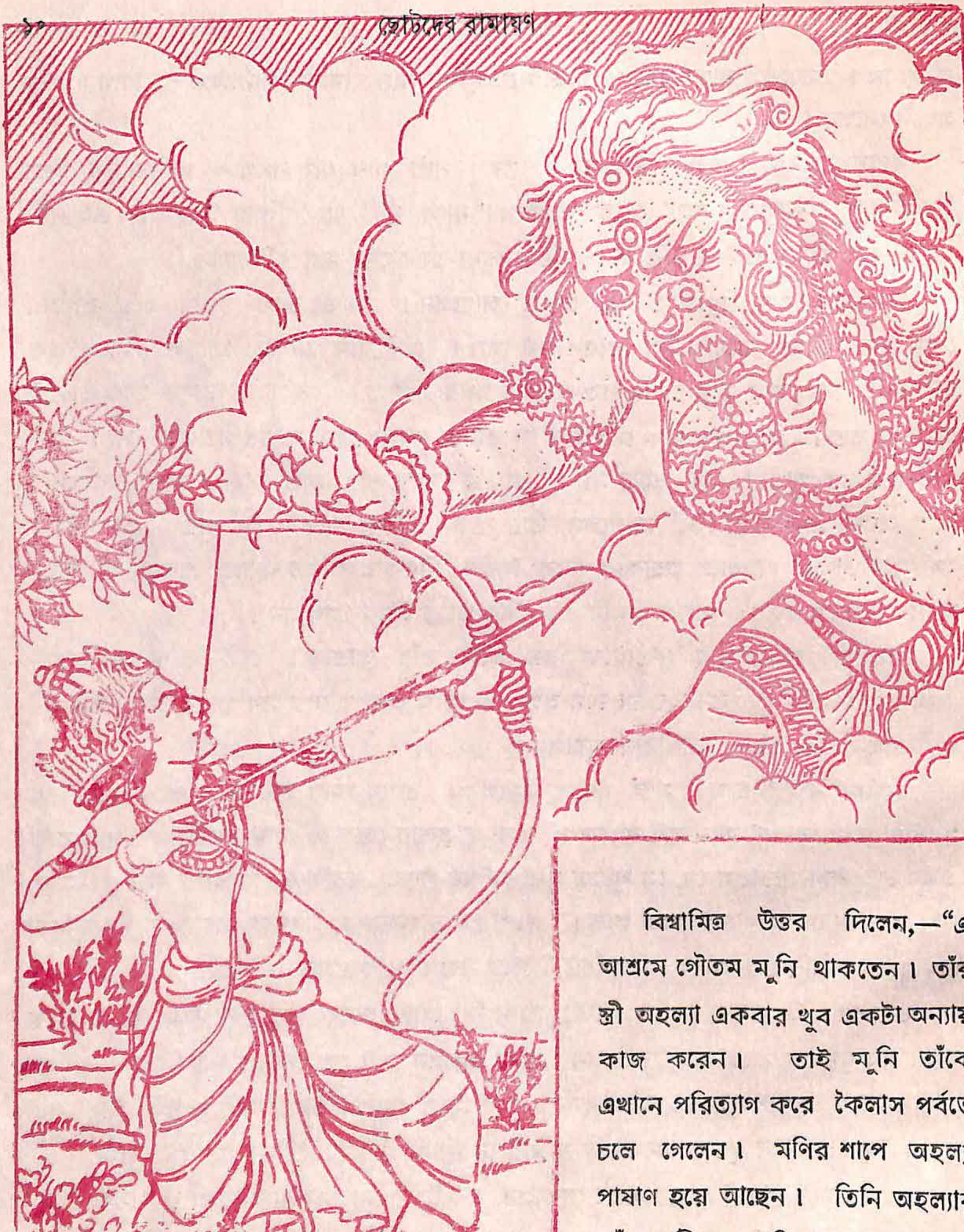
তারপর আবার তিনজনে পথ চলতে লাগলেন। বনও ক্রমে গভীর হতে লাগল। শেষে এক ভীষণ বনে তাঁরা প্রবেশ করলেন। সেই বনে থাকত 'তাড়কা' নামে এক রাক্ষসী। তাড়কার ভয়ে বনের পশু-পক্ষীরা পর্যন্ত কাঁপত। সে যাকে সামনে পেত তাকেই খেয়ে ফেলত। রাম-লক্ষ্মণকে দেখামাত্র সে তাঁদের খাবার জন্য ঝড়ের মত ছুটে এল। কিন্তু রাম-লক্ষণকে খাওয়া তো সহজ নয়। রাম একবাণে তার হাত দু'খানা কেটে ফেললেন; আর, লক্ষ্মণ এক বাণে কেটে ফেললেন তার নাক। কিন্তু তাতেই কি তার বিক্রম কমে? সে ধুলো উড়িয়ে চারধার অন্ধকার ক'রে বিকট চীৎকার করতে করতে প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে রামকে গিলতে এল। রামও অমনি এক বানে তাকে মেরে ফেললেন।

তারপর বিশ্বামিত্র মুনি দু'ভাইকে নিয়ে এলেন তাঁর আশ্রমে! সেই তপোবনে আরও অনেক মুনি-ঋষি ছিলেন। তাঁরা রাম-লক্ষণকে দেখে আর তাঁদের সব গুণের কথা শুনে খুব খুশী হলেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ করলেন।

পরদিন বিশ্বামিত্র মুনি যজ্ঞ করতে বসলেন। এমন সময় তাঁর যজ্ঞ পণ্ড করতে এল 'মারীচ' আর 'সুবাহু' নামে দুই রাক্ষস। এরা তাড়কার ছেলে। রাম তখনি মারীচের বুকে এমন এক বাণ মারলেন যে, সে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল একেবারে সমুদ্রের ধারে। আর, বাণ খেয়ে সুবাহু সেখানেই মারা গেল। তপোবনে রাক্ষসদের উৎপাত বন্ধ হ'ল। মুনিরা খুব খুশী ও নিশ্চিন্ত হলেন। বিশ্বামিত্র নির্বিঘ্নে যজ্ঞ শেষ করলেন।

তারপর মুনি রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে চললেন মিথিলায় জনক রাজার বাড়ি। রাজা জনক তখন খুব ধুমধাম করে যজ্ঞ করছিলেন। তাঁরা চললেন সেই যজ্ঞ দেখতে। মিথিলা রাজ্য ছিল সেখান থেকে অনেক দূরে। তাঁরা বনপথ ধরে যেতে যেতে তিনটি রাত্রি ও দুটি দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনে দূর থেকে জনক রাজার রাজধানী মিথিলা তাঁদের চোখে পড়ল।

এমন সময়ে দু'ভাই পথের পাশে দেখলেন, একটি পুরানো ও শূন্য আশ্রম। রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞেস করলেন,—"এ কার আশ্রম?"



বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,—"এ আশ্রমে গৌতম মুনি থাকতেন। তাঁর স্ত্রী অহল্যা একবার খুব একটা অন্যায় কাজ করেন। তাই মুনি তাঁকে এখানে পরিত্যাগ করে কৈলাস পর্বতে চলে গেলেন। মণির শাপে অহল্যা পাষাণ হয়ে আছেন। তিনি অহল্যার কাঁদাকাটিতে বলেছিলেন, রাজা দশ-রথের বড় ছেলে রাম এসে তাঁকে

রাম কর্ত্তৃক তাড়কা রাক্ষসী বধ

উদ্ধার করবে। তা রাম, তুমি যখন এখানে এসেছ তখন অহল্যাকে একবার দেখে যাও।

রামচন্দ্র মুনির কথায় রাজী হয়ে অহল্যাকে দেখতে গেলেন। অহল্যা তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় ছোঁয়াতেই শাপমুক্ত হয়ে রামকে পূজা করলেন।

সেখান থেকে তিনজনে গিয়ে পৌঁছলেন মিথিলায়। রাজা জনক তাঁদের দেখে মহা খুশী হলেন। তিনি তাঁদের যথোচিত আদর-যত্ন করলেন। যখন শুনলেন রাম-লক্ষ্মণ কে, আর তাঁরা কেমন বীর ও গুণবান, তখন রাজা জনকের আনন্দ আর ধরে না।

রাজা জনকের সীতা নামে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিল। সীতা তাঁর নিজের মেয়ে নয়। রাজা জনক নিজের হাতে জমিতে লাঙল দিতেন। একদিন জমিতে লাঙল দিতে দিতে লাঙলের ফলার মুখে একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে তিনি পান এবং মেয়েটির নাম রাখেন 'সীতা'। তারপর থেকে মেয়েটিকে ঠিক নিজের মেয়ের মতো করে স্নেহ-যত্নে পালন করতে থাকেন। তাই থেকে লোকের ধারণা হয়, সীতা জনক রাজার মেয়ে।

রাজা জনকের বাড়িতে একটি প্রকাণ্ড ধনুক ছিল। ধনুকটি শিবের। রাজা জনক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যিনি সেই ধনুকে গুণ পরাতে পারবেন তাঁর সঙ্গে সীতার বিয়ে দেবেন। তাই শুনে নানা দেশের বড় বড় বীরেরা এসেছিলেন ধনুকটিকে গুণ পরিয়ে সীতাকে বিয়ে করতে। কিন্তু গুণ পরানো তো দূরের কথা, কেউ ধনুকখানি হাতে তুলতে বা একটু নোয়াতেও পারেন নি। সবাই লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে ফিরে গেছেন।

বিশ্বামিত্র মুনি রাজা জনকের সঙ্গে গিয়ে রামকে ধনুকখানি দেখালেন। রাম ধনুকখানি স্বচ্ছন্দে হাতে তুলে তাতে গুণ পরিয়ে এমন জোরে এক টান দিলেন যে, ধনুকখানি মড় মড় শব্দে ভেঙে গেল। সেই শব্দে সারা মিথিলার লোক চমকে উঠল। রামের শক্তি দেখে রাজা ও রাজবাড়ির সকলে অবাক হয়ে গেলেন।

রাজা জনক খুব খুশী হয়ে রামের সঙ্গে সীতার বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন এবং রাজা দশরথকে আনতে অযোধ্যায় দূত পাঠালেন।

রাজা দশরথ দূতের মুখে সব কথা শুনে এত খুশী হলেন যে, ভরত, শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠ মুনিকে নিয়ে রথে চড়ে খুব ঘটা করে শীঘ্রই মিথিলায় এলেন।

মিথিলায় উৎসব শুরু হ'ল। সকলে আনন্দে মেতে উঠল।

বশিষ্ঠ মুনি খুব বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি দেখলেন, রাজা জনকের নিজের উর্মিলা নামে একটি আর তাঁর ভাইয়ের মাণ্ডবী ও শ্রুতিকীর্তি নামে দু'টি মেয়ে আছে। তিনটি মেয়েই

ভারি সুন্দরী। এই মেয়ে তিনটির সঙ্গেও বাকি তিন ভাইয়ের বিয়ে দিলে চমৎকার হয়। রাজা জনকের কাছে এই কথা তুলতেই তিনি তখনি রাজী হলেন।



মিথিলায় রামচন্দ্র কর্তৃক ধনুক ভঙ্গ

তখন ভাল দিন-ক্ষণ দেখে রামের সঙ্গে সীতার, ভরতের সঙ্গে মাণ্ডবীর, লক্ষ্মণের সঙ্গে ঊর্মিলার আর শত্রুঘ্নের সঙ্গে শ্রুতকীর্তির খুব ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। সকলে খুব খুশী হলেন। মিথিলায় আনন্দোৎসবের বান ডেকে গেল। অতিথি, অভ্যাগত, নিমন্ত্রিত দীন-দুঃখী রাজার আদর-যত্নে ও দান-ধ্যানে এত খুশী হ'ল যে বলে শেষ করা যায় না।

পরদিন সকালে রাজা দশরথ ছেলে-বউ নিয়ে রথে চড়ে অযোধ্যায় চললেন। রাজা জনক বর-কনেকে নানা রকমের মূল্যবান সামগ্রী, হাতী-ঘোড়া, দাস-দাসী যৌতুক দিলেন। সে-সবও চলল তাঁদের সঙ্গে.

সকলে কিছুদূর গেছেন, এমন সময়ে সকলে শুনতে পেলেন ভীষণ শব্দ—মনে হ'ল যেন ঝড় ছুটে আসছে। একটু পরেই দেখলেন, হাতে প্রকাণ্ড ধনুক, কাঁধে ধারাল কুঠার নিয়ে এক বিরাট পুরুষ তাঁদের দিকেই বীরদর্পে এগিয়ে আসছেন। দেখেই রাজা দশরথ চিনতে পারলেন, তিনি পরশুরাম। তিনি একুশবার পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করেছেন। যুদ্ধে

তাঁর সঙ্গে কেউ পারে না। তাঁর নাম শুনলেই বড় বড় বীরদের বুক কেঁপে ওঠে। তিনি পিতার আজ্ঞায় নিজের মাকেও হত্যা করেছেন। ক্ষত্রিয়দের উপর তাঁর ভারি রাগ।

তিনি এসেই রামকে বললেন,—"শুনলাম, তুমি নাকি শিবের ধনুক ভেঙেছ? আচ্ছা, আমার এই ধনুকে গুণ পরিয়ে একবার টানো দেখি। তারপর তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে দেখব, তুমি কত বড় বীর।"

পরশুরামের কথা শুনেই রাজা দশরথের বুক কেঁপে উঠল। তিনি ভয়ে সারা হলেন।

রাম বাবার সেই অবস্থা দেখে পরশুরামের কাছে অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু পরশুরাম সে কথা কানেই তুললেন না।



রামচন্দ্রকে পরশুরাম ধনুকে গুণ পরিয়ে দিতে বললেন

অগত্যা রামকে তাঁর কথাতেই রাজী হতে হ'ল। তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর ধনুকে গুণ পরিয়ে এমন টান দিলেন যে সেই টঙ্কারেই পরশুরাম একেবারে হতভম্ব। বুঝলেন, রাম বীর বটে। তিনি রামের অনেক সুখ্যাতি করে মহেন্দ্রপর্বতে চলে গেলেন। তখন ক্ষত্রিয়রা নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর সকলে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। রাজধানীতে আনন্দ-কোলাহল পড়ে গেল। রাজবাড়ীতে মহাধুমধাম শুরু হ'ল। রাণীরা চার বউকে সাদরে বরণ করে ঘরে তুললেন।

রাজা দশরথ ও রাণীদের সুখের সীমা নেই।



অযোধ্যাকাণ্ড

তারপর দিন যায়।

রাজা দশরথ ক্রমে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। রাজকার্যে আর পরিশ্রম করতে পারেন না। তাই ঠিক করলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাণীদের নিয়ে বনে যাবেন। সেখানে ঘর বেঁধে জীবনের বাকী ক'টা দিন তপস্যায় কাটাবেন।

তাই একদিন মন্ত্রীদের কাছে নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শুনে মন্ত্রীদের বড় আনন্দ হ'ল। রামকে সকলেই ভালবাসেন। এমন সোনার চাঁদ রাজপুত্র রাজা হবেন, এর চেয়ে সুখের কথা আর কি?

বশিষ্ঠ মুনি রামের অভিষেকের দিন-ক্ষণ স্থির করে দিলেন। প্রজারা সকলে শুনল, রাম রাজা হবেন। শুনে তাদের আহ্লাদ আর ধরে না। রাজবাড়িতেও সকলে খুব আনন্দিত হলেন।

শেষে অভিষেকের দিন এল। অযোধ্যানগর ও রাজবাড়ি ফুল, পাতা, কলাগাছ ও নিশানা দিয়ে সাজানো হ'ল। ধূপ-ধুনো ও চন্দনের গন্ধে নগর ভরে উঠল। চারধারে নাচ গান, আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনার শব্দ। প্রত্যেক বাড়ির দরজায় মঙ্গলঘট, প্রত্যেক লোকের মুখে হাসি। আনন্দে যেন সারা দেশ মেতে উঠেছে। প্রত্যেকের মুখে এক কথা, 'রামচন্দ্র আজ রাজা হবেন।'

রাজা-রাণী সকলেরই মনে আনন্দ আর ধরে না। রামকে অভিষেক বাড়িতে স্নান করানো হচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সিংহাসনে বসবেন।

এমন সময় রাজার অন্তঃপুরে একটি ঘটনা ঘটছে।

মেজো রাণী কৈকেয়ীর মন্থরা নামে এক দাসী ছিল। তার পিঠে একটা কুঁজ ছিল বলে সকলে তাকে 'কুঁজী' বলে ডাকত। কুঁজী ভরতকে মানুষ করেছিল, কিন্তু কুঁজীর মন ছিল বড় কুটিল। সে পরের ভাল দেখতে পারত না।

সেদিন সে যখন শুনল যে, রাম আজ রাজা হবেন, তাই লোকের এত আনন্দ-কোলাহল, চারিদিকে এত ধুমধাম, তখন হিংসায় তার বুক জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগল। সে ছুটল রাণী কৈকেয়ীর কাছে।

তাঁর কাছে গিয়ে সে রাগে গর গর করতে করতে বলল,—"আজ রাম নাকি অযোধ্যার রাজা হবে?"

রাণী কৈকেয়ী খবরটি শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, কারণ তিনি রামকে নিজের ছেলে ভরতের মতোই ভালবাসতেন। কুঁজী এমন সুখবর দেওয়ায় রাণী নিজের গলা থেকে হার খুলে তাকে পুরস্কার দিলেন।

তাতে কুঁজী আরও জ্বলে উঠল। সে হার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল,—"তুমি বড় সরল মানুষ। তাই রাম রাজা হবে শুনে তোমার আনন্দ হ'ল; কিন্তু আমরা যারা তোমার মঙ্গল খুঁজি তাদের এতে একটুও আনন্দ হচ্ছে না। রাম তোমাকে নিজের মায়ের মতো ভক্তি করে। তুমি তাতেই গলে যাও। কিন্তু তার মনের ভেতর কী আছে তা তুমি জান? সে রাজা হলে কি আর তোমায় মানবে, না তোমার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকবে? সে তখন হয়তো তোমার ভরতকে মেরেই ফেলবে, কি রাজ্য থেকে তাড়িয়েই দেবে। আর কৌশল্যাই কি

তখন তোমায় ছেড়ে কথা কইবে ? রাজা তোমায় ভালবাসেন ব'লে মনে করেছ তখনও তোমার এই রকমই প্রতিপত্তি থাকবে ?

কুঁজীর কথায় রাণী কিছু ভাবনায় পড়লেন ! সেই সুযোগে কুঁজী তাঁর মন ভাঙবার জন্য আরও অনেক কথা বলল। তাতে রাণী কৈকেয়ীর মন সত্যিই ভেঙে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন, কী করা যায় ? কুঁজী যা বলেছে, তা মিথ্যা নয় ; অথচ এমন কোন ফন্দিও মনে আসছে না যে রাজার সংকল্প পণ্ড করে দিতে পারেন। তিনি শেষে বললেন,—"বল্ তো কুঁজী, এখন কী করি ?"

কুঁজী বলল,—"তার আর ভাবনা কি ? রাজা তো তোমাকেই সব রাণীর চেয়ে ভালবাসেন। তোমার মনে পড়ে, রাজা একবার অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আহত হন ? তুমি তখন তাঁর খুব সেবা-শুশ্রূষা করেছিলে ? তিনি তা'তে তোমার উপর খুব খুশী হয়ে দু'টি বর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তুমি তখন নাওনি। বলেছিলে, পরে নেবে। এখন সেই বর দু'টি চাও। এক বরে চৌদ্দ বছরের জন্য রামকে বনে পাঠাও, আর এক বরে ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাও।"

কুঁজীর কু-পরামর্শে কৈকেয়ীর মন বিষিয়ে গেল। কৈকেয়ী কুঁজীর কথা শুনে ভাবলেন, এই ঠিক যুক্তি। সেকালে রাণীদের রাগ হ'লে তাঁরা গায়ের গহনা-পত্র খুলে একখানি ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকতেন। ঘরখানিকে বলা হ'ত গোসাঘর। কৈকেয়ীও তখন গায়ের গহনা খুলে ফেলে ময়লা ছেঁড়া কাপড়-জামা পরে গোসাঘরে গিয়ে শুয়ে রইলেন।

ওদিকে রাজা দশরথ রামের অভিষেকের সব বন্দোবস্ত করে রাণী কৈকেয়ীর কাছে এলেন শুভ খবরটি দিতে ; কিন্তু এসেই দেখলেন রাণী গোসাঘরে। রাজা দশরথ তাঁকে এমন শুভদিনে গোসাঘরে দেখে খুব দুঃখিত হলেন। তিনি রাণীর কাছে তাঁর দুঃখের কারণ জানতে চাইলেন, কিন্তু কৈকেয়ী কোন উত্তর দিলেন না। কয়েকবার জিজ্ঞেস করবার পর তিনি বললেন,—"রাণী, আজকের দিনে তুমি এমন মুখভার করে আছ ! এতে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। তুমি কি চাও বলো, আমি তোমাকে তা দোব।"

তাই শুনে কৈকেয়ী বললেন—"মহারাজ, একবার আমার উপর খুশী হয়ে আপনি আমাকে দু'টি বর দিতে চেয়েছিলেন, মনে আছে কি ? তখন বলেছিলাম, পরে নেব। আজ সেই বর দু'টি প্রার্থনা করবার সময় হয়েছে। আপনি আমায় তা দান করবেন কি ?

রাজা দশরথ পরম সত্যবাদী ছিলেন। রাণীর কথা শুনে বললেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করবেন। তখন রাণী কৈকেয়ী নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন,—"এক বরে রাম চৌদ্দ

বছরের জন্য বনবাস করবে, অপর বরে ভরত অযোধ্যার রাজা হবে ! এই দু'টি বর আমি চাই ।"

কৈকেয়ীর সেই মর্মান্তিক কথা শুনেই রাজা দশরথ সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে মুর্ছা ভাঙল। তখন তিনি কৈকেয়ীকে অনেক বোঝালেন, খুব কাকুতি-মিনতি করলেন ; কিন্তু রাণীর ঐ এক কথা ! তাই শুনে রাজার আবার মুর্ছা হ'ল।

তখন কৈকেয়ী রামকে ডেকে পাঠালেন। রাম এলে তিনি বললেন,—"বাছা রাম, মহারাজের ইচ্ছা যে ভরত অযোধ্যার রাজা হয়, আর তুমি চৌদ্দ বছরের জন্যে বনে যাও। কিন্তু রাজা নিজ মুখে তোমাকে সে কথা বলতে পারছেন না বলে এমন কাতর হয়ে পড়েছেন।"

বিমাতার কথা শুনে রাম প্রথমে স্তম্ভিত হলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে ধীরভাবে বললেন,—"মা, ভরত অযোধ্যার রাজা হবে, এতো সুখের কথা। বাবা যখন একথা বলেছেন, তখন আমি আজই বনে যাব।"

এমন সময় রাজা দশরথের আবার মূর্ছা ভাঙল। তিনি সামনে রামকে দেখে কেবল "রাম" এই কথাটি বলেই খুব কাতর হয়ে পড়লেন।

রামচন্দ্র রাজা দশরথের সেই ভাব দেখে বললেন,—"বাবা, আপনি এমন কাতর হচ্ছেন কেন ? আপনার সত্যপালনের জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি। ভরত রাজা হবে, এ তো সুখের কথা। আমি আজই বনে যাব। আপনি কাতর হবেন না।"—এই বলে তিনি পিতা ও বিমাতার পায়ের ধূলো নিয়ে রাণী কৌশল্যার কাছে গেলেন বিদায় নিতে।

রাণী কৌশল্যা তখন ঠাকুরঘরে বসে দেবতার কাছে রামের মঙ্গল কামনা করছিলেন। রাম তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে সব কথা জানালেন।

তাই শুনে কৌশল্যা মায়ের বুক ফেটে যেতে লাগল। আজ কোথায় তার রাম রাজা হবেন তা না হয়ে পিতৃ-সত্য পালনের জন্য তিনি চললেন বনবাসে। তিনি হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। রাম তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু কেবল কথায় তো মায়ের মন মানে না।

সেখান থেকে তিনি এলেন সীতার কাছে বিদায় নিতে। রামের মুখে সব কথা শুনে তাঁর বুক ফেটে যেতে লাগল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—"তুমি যেখানে থাকবে আমিও সেখানে থাকব।"

রাম তাঁকে বনবাসের নানারকম দুঃখ কষ্টের কথা বলে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন।

তবুও সীতা ভয় পেলেন না, বললেন—"তোমার জন্য আমি সব দুঃখ কষ্ট হাসি মুখেই সইব। আমি তোমার সঙ্গে বনে যাব!

রাম তখন তাঁকে সঙ্গে নিতে আপত্তি করলেন না।

তারপর রাম চললেন লক্ষ্মণের কাছে বিদায় নিতে। লক্ষ্মণকে সকল কথা জানাতে তিনি তো রাগে কাঁপতে লাগলেন। তিনি কৈকেয়ীর উপর ভীষণ রেগে উঠলেন। লক্ষ্মণ তাঁকে তো কটু কথা বললেনই, এমন কি পিতা দশরথেরও নিন্দা করতে লাগলেন।

তিনি বললেন,—"রাজা বুড়ো হয়ে সব বুদ্ধি-শুদ্ধি হারিয়েছেন। এমন অবিচার কিছুতেই সহ্য করব না। আমি বেঁচে থাকতে তোমায় বনবাসে যেতে দোব না। রাজ্যের সকলে যদি একদিকে হয় তবুও আমি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমাকেই অযোধ্যার সিংহাসনে বসাব।"

রাম খুব বিচক্ষণ সহিষ্ণু এবং ধার্মিক ছিলেন। তিনি জানতেন লক্ষ্মণ তাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসেন। সেজন্য লক্ষ্মণ মাতা পিতার বিরুদ্ধে এমন সব কথা বলছেন। তিনি লক্ষ্মণকে বুঝিয়ে বললেন,—"ভাই লক্ষ্মণ, পুত্র যদি পিতার সত্য রক্ষা না করে তাহলে সে পুত্র নামের যোগ্য নয়। সত্য রক্ষাই ধর্ম। তুমি শান্ত হও।"

লক্ষ্মণ রামের মিষ্টি কথায় শান্ত হলেন, কিন্তু তিনি জানালেন যে তিনিও রামের সঙ্গে বনে যাবেন।

এদিকে অযোধ্যার ঘরে ঘরে এই মর্মান্তিক খবর ছড়িয়ে পড়ল। নগরের যত উৎসব কোলাহল, গান বাজনা সব থেমে গিয়ে শোকের ছায় পড়ল। সকলের মুখ ম্লান।

রাজা দশরথের সারথি ছিলেন সুমন্ত্র। তিনি রথ আনলেন। রাম ও লক্ষ্মণ বনবাসীর বেশে গাছের ছাল পরে তাতে উঠলেন। সীতাকে বনবাসিনীর বেশ পরতে হয়নি। তিনি স্বাভাবিক পোশাকেই রথে গিয়ে উঠলেন। সুমন্ত্র নগরের পথ দিয়ে রথ চালিয়ে চললেন বনের দিকে।

রথের পিছন পিছন হাহাকার করতে করতে ছুটল অযোধ্যাবাসী বৃদ্ধ-যুবক-বালক নারী সকলে। রাজা দশরথও কাঁদতে কাঁদতে ছুটলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তিনি পথের উপর মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁর সে মূর্চ্ছা আর ভাঙল না! তার চারদিন পরে তিনি মারা গেলেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে রথ ছুটল। নগরবাসীরাও তাদের প্রাণের রাজকুমারের

রথের পিছন পিছন হাহাকার করতে করতে ছুটছে। এমনি করে তারা অনেক দূর চলে গেল। পরে তারা ফিরে এল।

সন্ধ্যার সময় তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন তমসা নদীর তীরে। সে রাত্রে সেখানেই বিশ্রাম করে পরদিন আবার রথে উঠে চলতে লাগলেন।

সেখান থেকে কিছুদূরে গঙ্গাতীরে ছিল গুহক চণ্ডালের রাজ্য। রাজা গুহক ছিলেন রামের পরম বন্ধু। রাম আসছেন শুনে গুহক নিজে এগিয়ে গেলেন রামকে অভ্যর্থনা করতে। রথ গঙ্গাতীরে পৌঁছলে দুই বন্ধুতে মিলন হ'ল। গুহক তাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। রামকে তিনি তাঁর রাজ্যে রাজা করে রাখতে চাইলেন। কিন্তু রাম কিছুতেই তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন



রাম আসছেন শুনে গুহক নিজে এগিয়ে গেলেন রামকে অভ্যর্থনা করতে।

না, বললেন, "ভাই, পিতৃ-সত্য পালনের জন্য বনে যাচ্ছি। তা না করলে অধর্ম হবে। চৌদ্দ বছর পরে ফিরে এসে আমি আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

গুহক আর কী করবেন? বন্ধুর জন্য তাঁর খুবই দুঃখ হতে লাগল।

সেখান থেকে রথ ফিরিয়ে দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে তারা সন্ন্যাসীর বেশ পরলেন। তারপর

গভীর বনে প্রবেশ করে চলতে লাগলেন। কোথায় বা সেই রাজবেশ! কোথায় বা সেই রাজভোগ আর কোথায়ই বা রাজপ্রাসাদ! দু'ভাইয়ের মাথায় জটা, পরনে গাছের ছাল। তাঁদের খাদ্য হ'ল বনের ফল-মূল, আশ্রয় হ'ল বৃক্ষ-তল।

তিনজনে চলতে চলতে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গিয়ে পেঁাছলেন। মুনি তাদের খুব আদর যত্ন করলেন। তারপর সেখান থেকে চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। সেখানকার শোভায় তাঁরা মুগ্ধ হলেন।

অযোধ্যায় যখন এই সব কাণ্ড ঘটছিল, তখন ভরত তাঁর মামার বাড়ি নন্দীগ্রামে ছিলেন। শত্রুঘ্নও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। তাঁরা এ সবের কোন খবরই পাননি। রাজা দশরথ মারা গেলে অযোধ্যা থেকে দূত সেই দুঃসংবাদ নিয়ে তাঁদের কাছে ছুটল। কিন্তু দূত সেখানেও তাঁদের অযোধ্যার সকল কথা জানালেন না।

ভরত ও শত্রুঘ্ন তাড়াতাড়ি অযোধ্যায় ফিরে এসে সব কথা শুনলেন। শুনে ভরত দুঃখে ও রাগে মায়ের প্রতি ঘৃণায় এমন হয়ে গেলেন যে, তাঁর মায়ের মুখ দেখতেও ইচ্ছা হ'ল না। কৈকেয়ীও তাঁকে মুখ দেখাতে পারলেন না। আর শত্রুঘ্ন রাগে এমন জ্বলে উঠলেন যে, কুঁজীকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেললেন।

দু'ভাই তখন গেলেন কৌশল্যা মায়ের কাছে। মায়ের পা ধরে তাঁরা খুব কাঁদলেন। কৌশল্যা-মা ছেলে দু'টিকে বুকে নিয়ে জ্বালা কতক মিটালেন। তাঁদের দোষ কি? তাঁদের বুকও যে দুঃখে ফেটে যাচ্ছে।

ভরত বললেন, তিনি রাম, লক্ষণ ও সীতাকে ফিরিয়ে আনবেন। তারপর তিনি ও শত্রুঘ্ন চললেন তাঁদের ফিরিয়ে আনতে। সঙ্গে নিলেন রথ, হাতী, ঘোড়া ও বিস্তর সৈন্য-সামন্ত। কিন্তু রামচন্দ্র কোথায় আছেন তা তো তাঁরা জানেন না। তাই জিজ্ঞেস করতে করতে চললেন, কোন্ দিকে তাঁরা গেছেন। কিন্তু ভরতের বড় মুশকিল হ'ল। সকলেই তাঁকে সন্দেহ করতে লাগলেন। মনে করলেন, তিনি রামকে হত্যা করতে যাচ্ছেন।

গুহক চণ্ডাল পথে লাঠি নিয়ে দাঁড়ালেন তাঁকে এগোতে দেবেন না ব'লে। শেষে যখন শুনলেন, তিনি রামকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছেন, তখন পথ ছেড়ে দিলেন। সেখান থেকে তিনি এলেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। মুনিও প্রথমে রামের সন্ধান দিলেন না। শেষে ভরতের ব্যবহারে ও কথায় আশ্বস্ত হয়ে রাম কোন্ দিকে গেছেন দেখিয়ে দিলেন।

ভরত সেই দিকে চলতে চলতে চিত্রকূট পর্বতে পেঁাছে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার দেখা পেলেন। চার ভাইয়ের মিলন হ'ল। দুঃখে, শোকে, আনন্দে চার ভাইয়ের চোখ ছাপিয়ে জল ঝরতে লাগল।

ভরত রামের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাজ্যভার নিতে কত অনুনয় করলেন।

রামচন্দ্র প্রাণের ভাইকে বুকে তুলে নিয়ে বোঝাতে লাগলেন যে, তিনি ফিরে যেতে পারেন না। কিন্তু ভরত কি সহজে বুঝতে চান? কি ছার রাজ্য?

রাম তাঁকে বোঝালেন যে, ভরতের কোন দোষ নাই। তিনিই পিতৃ-সত্য পালনের জন্য বনে এসেছেন। চৌদ্দ বছর বনে বাস না করলে যে পিতার সত্য পালন করা হবে না, তাহলে অধর্ম হবে।

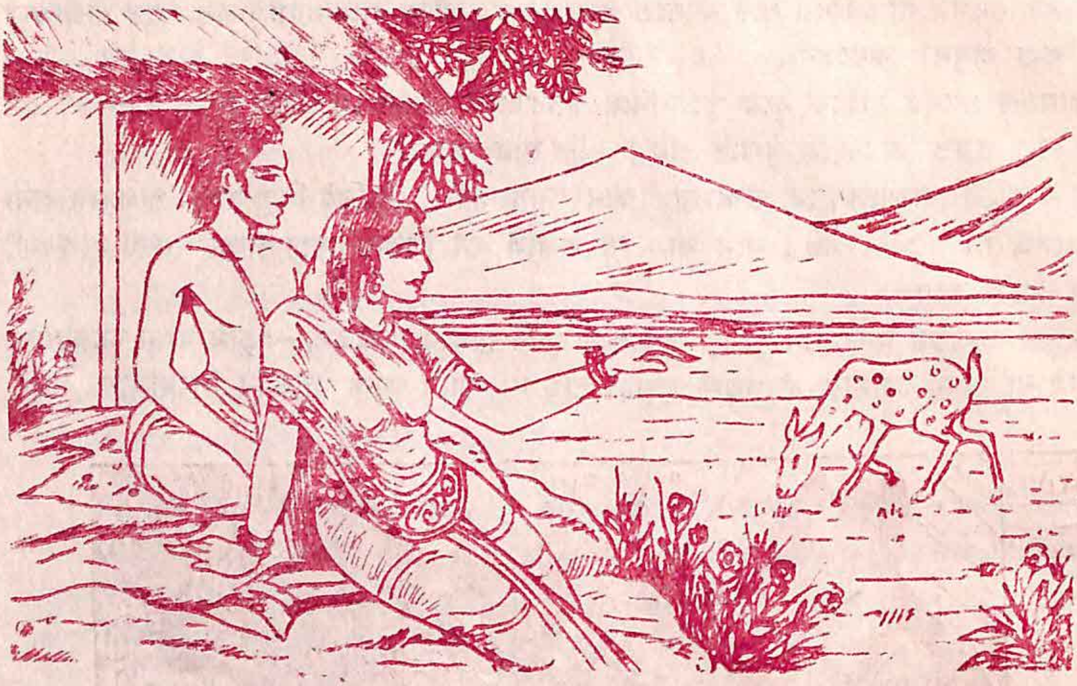
তবুও ভরতের মন মানে না। অবশেষে তিনি রামকে বললেন,—"তুমি যখন অযোধ্যায় ফিরবেই না তখন তোমার ঐ খড়ম জোড়া দাও। আমি খড়ম দু'খানি সিংহাসনে রেখে



সোনার সিংহাসনের উপর খড়ম রেখে ভরত রামের নামে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

তোমারই নামে চৌদ্দ বছর রাজ্য শাসন করব। কিন্তু আমিও আর অযোধ্যায় ফিরে যাব না, নন্দীগ্রামে রাজধানী স্থাপন করে সেখানেই থাকব। কিন্তু চৌদ্দ বছর পূর্ণ হলে পরদিনই যদি তুমি ফিরে না যাও, তবে আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে এ প্রাণ বিসর্জন দোব।"

রাম আর কি করেন? তিনি ভরতকে নিজের পা থেকে খরম জোড়া খুলে দিলেন। ভরত খরম জোড়া মাথায় তুলে নিয়ে শত্রুঘ্নের সঙ্গে ফিরে চললেন নন্দীগ্রামে। সেখানে সোনার সিংহাসনের উপর খড়ম রেখে ভরত রামের নামে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।



অরণ্যকাণ্ড

ভরত ও বাড়ির আর সকলে চলে গেল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে সেখান থেকে চললেন দণ্ডকবনের দিকে। শুনেছিলেন সে বনে অনেক মুনি ঋষির বাস এবং সে বনের শোভাও অপরূপ।

তিনজনে দণ্ডকবনে এলেন। সেখানকার মুনি-ঋষিগণ তাঁদের খুব আদর যত্ন করলেন। তাঁদের ব্যবহারে মুনি-ঋষিগণও খুব খুশী হলেন। তাঁরা বুঝলেন, রাম অশেষ গুণবান।

সেই বনে বাস করতেন অগস্ত্যমুনি ; তাঁর খুব তেজ। তিনি এক গণ্ডুষে সমুদ্রশোষণ করেছিলেন, বিন্ধ্যপর্বতের গর্ব খর্ব করেছিলেন। তাই সকলেই তাঁকে খুব সম্মান করত। মুনির সঙ্গে রামের পরিচয় হ'ল। মুনি রামকে অনেক রকমের অস্ত্র দিলেন।

রাম তাঁকে বললেন, "মুনিবর একটু ভাল জায়গা পেলে সেখানে কুটীর বেঁধে বাস করাই আমাদের ইচ্ছা। এদিকে সে রকমের কোন জায়গা আছে কি ?"

অগস্তমুনি উত্তরে বললেন,— "পঞ্চবটী বনের শোভা বড়ই চমৎকার। সেখানে ফল, মূল ও পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়া যায়। তোমরা সেখানে যাও।"

এই বনে বাস করতেন পক্ষিরাজ জটায়ু। তিনি ছিলেন রাজা দশরথের পরম বন্ধু। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

জটায়ু খুশী হয়ে বললেন, "আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি, তবু যতটা পারি তোমাদের দেখব। তোমরা আর কোথাও যেও না। এখানেই কুটীর বেঁধে থাক।"

রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে সেখানেই একটি চমৎকার জায়গায় কুটীর বাঁধলেন। বনের শোভা দেখে তিনজনেই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেখানে ছিল প্রচুর ফলমূল ও ঝরণার সুমিষ্ট জল। তাঁরা সেই বনেই বাস করতে লাগলেন।

কিন্তু পঞ্চবটী বন ছিল জনস্থান নামে একটি বিশাল বনের একটি অংশ। জনস্থানে ছিল সুন্দর সুন্দর পাহাড়, নানারকমের পশু-পাখি, আর ছিল রাক্ষসদের বাস। তারা বনের সর্বত্র ঘোরাফেরা করত। সুবিধা পেলে মুনি-ঋষিদেরও আশ্রমে উৎপাত করতে ছাড়ত না।

যাই হোক, রাম, লক্ষণ ও সীতার দিন সেখানে বেশ সুখেই কাটতে লাগল। এমন সময়ে একদিন হঠাৎ বিষম গণ্ডগোল বাধল। লঙ্কার রাক্ষস রাজ রাবণের 'শূর্পনখা' নামে এক বোন ছিল। সে ঐ বনে বেড়াতে বেড়াতে রামকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। অমনি রামের কাছে এসে একেবারে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল। সে বলল—"আমি লঙ্কার রাজা রাবণের বোন। আমায় তুমি বিয়ে কর।"

রাম তো সে কথা শুনে হেসেই সারা।

শূর্পনখা গেল লক্ষ্মণের কাছে। তাঁকেও ঐ কথা বলল।

লক্ষ্মণও তার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। শূর্পনখার তাতে বড় অপমানবোধ ও রাগ হ'ল। সে হাঁ করে সীতাকে গিলে খেতে গেল।

আর যায় কোথায়! লক্ষ্মণ তখনই এক বাণে তার নাক-কান কেটে দিলেন। বেচারী শূর্পণখা তখন যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল। তার তখনকার চেহারা হ'ল আরও ভয়ংকর।

জনস্থানে তার দুই মাসতুতো ভাই থাকত। তাদের নাম ছিল 'খর' ও 'দূষণ'। শূর্পনখা সেই অবস্থায় গিয়ে তাদের কাছে সব কথা জানাল। বোনের দুর্দশা দেখে খর ও দূষণ উঠল ক্ষেপে। তারাও খুব বীর। তাদের নাম শুনেই সকলে ভয়ে কাঁপত।

তারা তখনই সেখান থেকে চৌদ্দ হাজার রাক্ষস জড় করল। তারা নানারকমের ভয়ংকর অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এল রাম-লক্ষণকে আক্রমণ করতে। কিন্তু রাম-লক্ষণকে যুদ্ধে পরাস্ত করার সাধ্য কারও ছিল না। তাঁরাও বাণে বাণে যুদ্ধক্ষেত্র অন্ধকার করে দিলেন। রাক্ষসদের শেল, শূল, সব কেটে খান খান ক'রে সেই চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকেই দু'ভাই মেরে ফেললেন। খর-দূষণও মারা গেল। কেবল একজন রাক্ষস কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালাল। তার নাম 'অকম্পন'।

সে ভয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই সাহস করল না। ছুটতে ছুটতে চলে গেল সেই সাগর পারে লঙ্কায় রাক্ষস-রাজ রাবণের রাজসভায়। সে রাজাকে এই ভয়ানক যুদ্ধের মর্মান্তিক খবর দিল ; নাক-কানকাটা শূর্পণখাও কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে রাজার কাছে রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে নালিশ করল।

রাবণ-রাজ অকম্পনের মুখে সব খবর শুনে আর বোনের দুর্দশা দেখে ভীষণ রেগে উঠলেন। কোথাকার দুটো মানুষ তাঁর বোনের এমন দশা করলে! রাক্ষসদের তারা মেরে ফেললে? তিনি তখনই যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরি হন আর কি। তিনিও তো কম বীর ন'ন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে দেব, দানব, মানুষ, কেউই পারে না। তাঁর ভয়ে ত্রিভুবন কাঁপে।

অকম্পন বলল,—"মহারাজ, রাম-লক্ষ্মণ সহজ মানুষ নয়। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে প্রাণ নিয়ে ফেরা দায়। তার চেয়ে মারীচকে পাঠান। সে তো নানারকম মায়া জানে। তাকে দিয়ে রামকে উচিত শিক্ষা দিন।"

রাবণ ভাবলেন, এ ভাল যুক্তি। তিনি মারীচকে ডেকে বললেন,—"বাপু মারীচ, তুমি আমার সঙ্গে জনস্থানে পঞ্চবটীতে চলো। রাম-লক্ষ্মণকে একবার দেখাতে হবে, আমরা সোজা নই। তারা আমাদের অপমান করবে আর আমরা সহ্য করব—এ হতেই পারে না। অপমাণের প্রতিশোধ নেবই।"

মারীচ হ'ল তাড়কা রাক্ষসীর ছেলে যে রামের বাণে ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়েছিল। তখন থেকে তার রামকে ভয় ও তাঁর উপর রাগ ছিল। সে বলল,—"আমায় কী করতে হবে আজ্ঞা করুন।"

রাবণ বললেন,—তুমি সোনার হরিণ সেজে রামের কুটীরের সামনে খেলা করবে। তোমাকে দেখে সীতার তোমাকে নেবার লোভ হবে। তার অনুরোধে রাম-লক্ষণ তোমাকে ধরতে যাবে। তুমি ছুটতে ছুটতে গভীর বনে চলে যেও। রাম-লক্ষ্মণও তোমার পিছনে ছুটবে। তখন সীতা কুটীরে থাকবে একা। সেই সুযোগে আমি তাকে চুরি করে আনব।"

যুক্তি মন্দ না হলেও মারীচের প্রথমে সাহস হ'ল না। কিন্তু রামের উপর তার রাগও ছিল। তার উপর আজ্ঞা পালন না করলে রাবণের হাতে নিস্তার নেই। তাই সে ভয়ে ভয়ে রাজী হ'ল।

তারপর মারীচকে নিয়ে রাবণ পঞ্চবটীতে এলেন। রাবণের পরামর্শমতো মারীচ সোনার হরিণ সেজে রামের কুটীরের সামনে খেলা করতে লাগল। আর, রাবণ-রাজা আড়ালে লুকিয়ে থাকলেন।

সীতা হরিণটিকে দেখতে পেলেন। কী সুন্দর হরিণটি! তিনি রামকে বললেন,—"হরিণটি আমায় ধরে দাও না।"

রাম লক্ষ্মণকে কুটীরে পাহারায় রেখে হরিণ ধরতে ছুটলেন। কিন্তু সেই মায়া-হরিণ ধরা কি সহজ কাজ? হরিণ চোখের পলকে গভীর বনে চলে গেল। রামও তার পিছু নিলেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, তবু রাম আসেন না দেখে সীতার বড় ভয় হ'ল। এমন সময়ে অলক্ষ্যে রামের গলার স্বর নকল ক'রে মায়া হরিণরূপী মারীচ চীৎকার করে উঠল,—"ভাই লক্ষণ, বাঁচাও।"

সীতা তাই শুনে ভয়ে একেবারে সারা হয়ে গেলেন,—লক্ষ্মণকে বললেন,—"শীগ্‌গির যাও, তোমার দাদা বিপদে পড়েছেন। তাঁর প্রাণ বুঝি যায়।"

লক্ষ্মণ ধীর ও শান্তভাবে বললেন,—"রামকে বধ করে ত্রিভুবনে কারও সাধ্য নেই। তাঁর কোন বিপদ ঘটেনি। ও মায়াবী-র মায়া।"

তাই শুনে সীতা লক্ষ্মণের উপর খুব রেগে উঠলেন। তিনি লক্ষ্মণকে এমন সব কথা বলে গাল দিলেন যা লক্ষ্মণের মতো ভাল লোককে বলা তাঁর উচিত হ'ল না। অগত্যা লক্ষ্মণকে রামের সন্ধানে যেতে হ'ল। কিন্তু যাবার সময় তিনি ধনুকের কোণ দিয়ে কুটিরের সামনে গণ্ডি টেনে সীতাকে ব'লে গেলেন,—"এর বাইরে যাবেন না, গেলে বিপদ হবে।"

সীতা তখন কুটীরে একা রইলেন। এই অবসরে রাবণ-রাজা সন্ন্যাসীর বেশে কুটীরে এসে ভিক্ষা চাইলেন! সীতা ভিক্ষা দিতে গেলে তিনি তাঁকে ধরে জোর করে রথে তুলে নিয়ে আকাশপথে লঙ্কায় পালিয়ে গেলেন। তখন সীতার সে কী কান্না।

এদিকে দু'ভাই কুটীরে এসে দেখেন, সীতা নেই। চারধারে কত তাঁকে খুঁজলেন। দুঃখে দু'ভাইয়ের চোখের জল আর বাধা মানে না! তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, জলাশয়ের তীরে সীতাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে পেলেন না। তাঁর নাম ধরে কত ডাকলেন, কেউ সাড়া দিল না।

দু'ভাই খুঁজতে খুঁজতে এলেন পক্ষিরাজ জটায়ুর কাছে। এসে দেখেন, জটায়ু রক্তাক্ত দেহে মড়ার মতো পড়ে আছেন। তিনি দু'ভাইকে দেখে বললেন,—"রাবণ আকাশ-পথে রথে



রাবণ জোর করে সীতাকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

সীতাকে নিয়ে পালাচ্ছিল। সীতার কান্না শুনে আমি রাবণের পথ আটকাই। কিন্তু বুড়ো হয়েছি, শরীরে সে শক্তি আর নেই। তবুও যথাশক্তি যুদ্ধ করেছিলাম। যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি! লঙ্কায় সীতার সন্ধান পাবে।" —এই কথাগুলি বলেই জটায়ু মারা গেলেন। তাঁদের সেই খবর দেবার জন্যই যেন তিনি বেঁচেছিলেন।

তখন দু'ভায়ের দুঃখের উপর আরও দুঃখ হ'ল। তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। তারপর দু'জনে জটায়ুর মৃতদেহের সৎকার করে আবার সীতার খোঁজে চললেন।

খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা এলেন গোদাবরী নদীর তীরে। সেখানে গভীর জঙ্গলে থাকত এক ভয়ংকর রাক্ষস। তার নাম ছিল 'কবন্ধ'। তার মাথা ছিল না, কপালে ছিল একটি



জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ

মাত্র চোখ, আর মুখ ছিল ঠিক পেটের উপর। তার একখানা হাত ছিল চার ক্রোশ লম্বা। হাত দিয়ে সে হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি গিলে খেত।

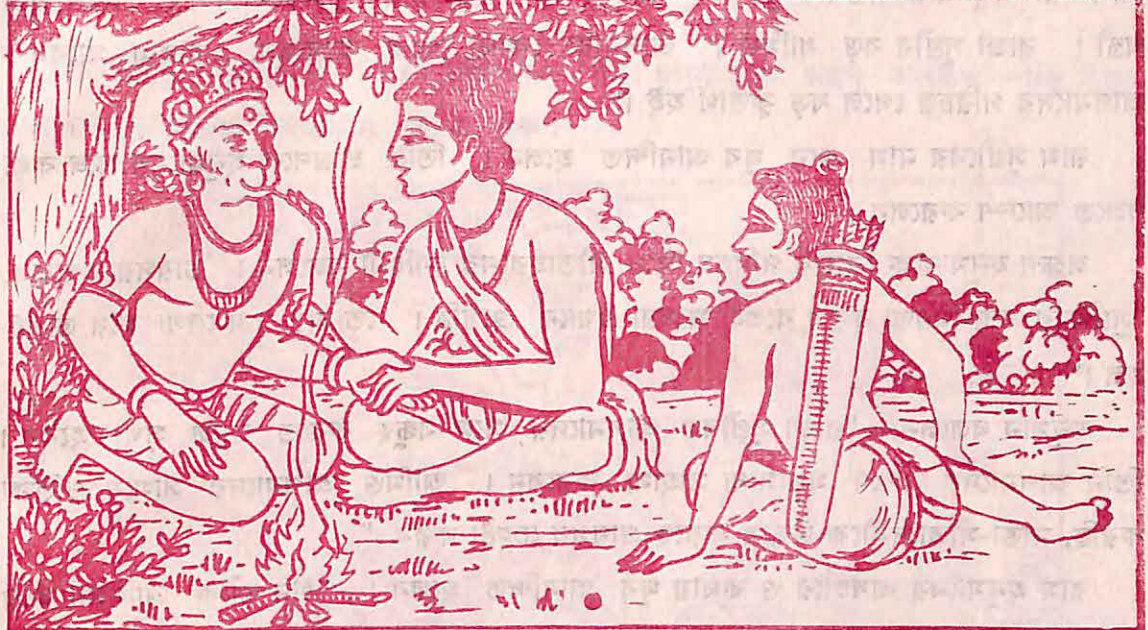


দুই ভাইয়ের সহিত জটায়ুর দেখা

দু'ভাইকে দেখেই সে তাঁদের ধরে খেতে এল। কিন্তু সে এগিয়ে আসতেই রাম এক বাণে তাকে বধ করলেন। অমনি তার বিকট দেহ থেকে বেরিয়ে এল এক সুন্দর মূর্তি। না বের হবেই বা কেন ? সে তো আসলে রাক্ষস ছিল না, ছিল এক দেবতা। এক মুনির শাপে তার অমন দশা হয়েছিল। তার কাকুতি-মিনতিতে মুনির মন গলে যায়। মুনি বলেছিলেন,—"শাপ তো আর ফেরানো যাবে না। তবে রামের হাতে মৃত্যু হলে সে শাপমুক্ত হবে।"

তখন সে রামের মুখে তাঁদের দুঃখের কথা শুনে বলল,—"তোমরা কিষ্কিন্ধ্যায় ঋষ্যমূক পর্বতে যাও। সেখানে বানরদের রাজা সুগ্রীব অতি দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর বড় ভাই বালী তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি সেখানে লুকিয়ে আছেন। তোমরা তাঁকে সাহায্য করলে তিনিও তোমাদের সীতা উদ্ধারে সাহায্য করবেন।" —এই বলে সেই দিব্য-মূর্তি অদৃশ্য হ'ল।

রাম-লক্ষ্মণও চললেন ঋষ্যমূক পর্বতের উদ্দেশ্যে।



কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

পম্পা নদীপারে ঋষ্যমূক পর্বত। দু'ভাই পম্পা নদী পার হলেন। কিন্তু সামনেই দেখলেন ভীষণ বন। সে বনে দিনের বেলায় ঢুকতেই ভয় করে। কিন্তু তাঁরা দু'জনেই বীর। তার উপর সীতার সন্ধানে চলেছেন। কাজেই ভয়-ডর, বাধা-বিপত্তি কিছুই মানছেন না।

দু'জনে বনের ভিতর দিয়ে চললেন। ঋষ্যমূক পর্বতের চারধারেই এই রকম গভীর বন। তাঁরা পর্বতের কাছাকাছি যেতেই সুগ্রীব তাঁদের দূর থেকে দেখতে পেয়ে বড় ভয় পেয়ে গেলেন। মনে করলেন বুঝি বালির চর তাঁর সন্ধানে আসছে। তখন তিনি হনূমানকে ডেকে বললেন,—"বাছা হনূমান, ঐ যে দু'টি মানুষ আসছে, ওরা কে কৌশলে জেনে এসো তো। দেখ দেখি ওরা বালীর চর কিনা?"

হনূমান তখনই রাম-লক্ষ্মণের খবর আনতে চললেন। কিছুদূর থেকে দু'ভাইয়ের মূর্তি দেখে তাঁর মনে ভক্তি দেখা দিল। ভাবলেন, বুঝি কোন মহাপুরুষই হবেন। তাই তাঁদের

কাছে গিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন,—মহাশয়গণ, আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে, আপনারা সাধু আর শক্তিমান পুরুষ। এই পর্বতে বানর-রাজ সুগ্রীব থাকেন। আমি তার মন্ত্রী! রাজা সুগ্রীব বড় ধার্মিক। আপনারা কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাবেন? আপনাদের পরিচয় পেলে বড় কৃতার্থ হই।"

রাম সুগ্রীবের নাম শুনে খুব আনন্দিত হলেন। তিনি লক্ষ্মণকে হনূমানের সঙ্গে কথা বলতে আদেশ করলেন।

লক্ষণ হনূমানকে নিজের পরিচয় দিয়ে সীতাহরণের কাহিনী বললেন। তারপর বললেন, "সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করব বলেই আমরা এখানে এসেছি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল।"

হনূমান বললেন,—"রাজা সুগ্রীবও আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পেলে সুখী হবেন। তিনি আপনাদের বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। আমিও আপনাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, মাতা-সীতাদেবীকে উদ্ধার করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।"

রাম হনূমানের ব্যবহারে ও কথায় খুব আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন,—"বিপদের সময় তোমার মতো বন্ধু পেয়ে আমরা ধন্য হলাম।"

হনূমান দু'ভাইকে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে এসে তাঁদের পরিচয় দিলেন।

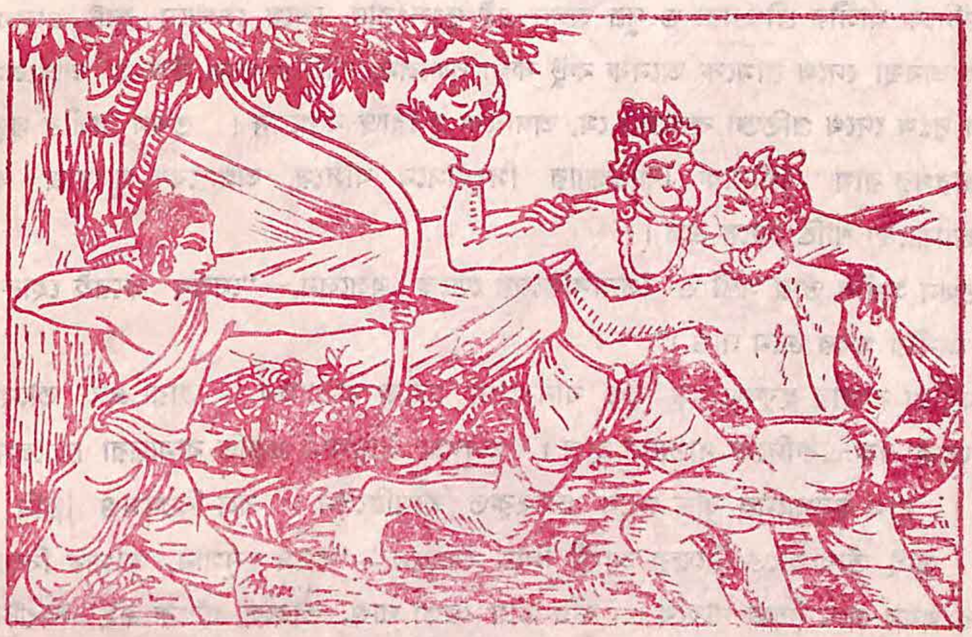
তাঁদের পরিচয় পেয়ে ও তাঁদের দেখে সুগ্রীবের বড় আনন্দ হ'ল। রাম-লক্ষ্মণও সুগ্রীবকে দেখে বড় আনন্দিত হলেন। তখন রাম ও সুগ্রীব অগ্নিসাক্ষী করে পরস্পরের বন্ধু হলেন। দু'জনেই দু'জনকে বিপদে প্রাণপণ সাহায্য করবেন ব'লে শপথ করলেন। সুগ্রীব বললেন, সীতা-উদ্ধারে তিনি সৈন্য-সামন্ত দিয়ে সাহায্য করবেন। তবে বালী বড় অত্যাচারী, ভয় হয় সে তাঁকে মেরেও ফেলতে পারে। রাম বললেন, তিনিও বালী-বধে সুগ্রীবকে সাহায্য করবেন।

তখন সুগ্রীব বললেন,—"সেদিন এক রাক্ষস একটি নারীকে চুরি করে নিয়ে আকাশ-পথে পালাচ্ছিল। মেয়েটির কান্না শুনে কেউ চোখের জল রাখতে পারেনি। এখন বোধ হচ্ছে, তিনিই আপনার পত্নী সীতা। আমরা তাঁর কান্না শুনে দেখতে গেলে তিনি তাঁর গায়ের ওড়না আর গহনা খুলে নীচে ফেলে দিয়েছিলেন। সেগুলি আমরা তুলে রেখে দিয়েছিলাম। দেখুন দেখি এগুলি চিনতে পারেন কিনা।"

রাজা সুগ্রীব ওড়না ও গহণাগুলি আনিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে দেখাতেই দু'ভাই চিনতে পারলেন। তাঁরা কাঁদতে লাগলেন।

সুগ্রীব তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন, বললেন,—"আপনারা বীর দুঃখ করে ফল লাভ হবে না। এখক কী করে সেই দুষ্টুকে সাজা দিয়ে সীতাকে উদ্ধার করা যায় তারই চেষ্টা করা যাক।"

রাম-লক্ষ্মণ শান্ত হলেন। রাম বললেন,—"বন্ধু চলুন তার আগে বালীকে শাস্তি দিয়ে আপনাকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসানো যাক।"



বালীর সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধ

রামের কথায় সুগ্রীবের খুব সাহাস হ'ল। তিনি কিষ্কিন্ধানগরে গিয়ে খুব লম্ফ ঝম্প করতে লাগলেন,—এবার তোমায় শেষ করব।"

বালী সুগ্রীবের কথা শুনে ও তাঁর স্পর্ধা দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু তিনি মুখে কিছু বললেন না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সুগ্রীবকে আক্রমণ করলেন। দু'ভাইয়ে ভীষণ লড়াই শুরু হ'ল। কিন্তু বালী ছিলেন খুব শক্তিশালী ও বীর। সুগ্রীব বেশীক্ষণ তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে পারলেন না, ধরাশায়ী হলেন।

রাম-লক্ষ্মণ দূরে দাঁড়িয়ে দু'ভাইয়ের যুদ্ধ দেখছিলেন। সুগ্রীব ধরাশায়ী হতেই রাম এক বাণে বালীকে মাটিতে ফেলে দিলেন। বালী মাটিতে পড়ে যেতেই দু'ভাই বালীর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁদের দেখেই-বালী রাগে জ্বলে উঠলেন ; বললেন,—"তুমি কাপুরুষ। আমরা দু'ভাইয়ে লড়াই করছি, আর তুমি আড়ালে থেকে আমায় বাণ মারলে। তোমার সঙ্গে ঝগড়া নয়। তুমি অতি নীচ"

রাম বললেন,—"তুমি যেমন অত্যাচারী, তেমনি অধার্মিক। তোমার মতো পাপীর এই উচিত শাস্তি।"

ওদিকে বালীর স্ত্রী তারা ও পুত্র অঙ্গদ এই দুঃসংবাদ পেয়ে সেখানে ছুটে এলেন। তাঁরা বালীর অবস্থা দেখে রামকে অনেক কটু কথা বললেন, বালীর জন্য কাঁদতে লাগলেন। রাম তাঁদের দুঃখ দেখে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, অঙ্গদকে যুবরাজ করবেন। তখন বালীর মৃত্যু হ'ল।

তারপর রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসিয়ে অঙ্গদকে যুবরাজ করলেন। কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে শান্তি ফিরে এল।

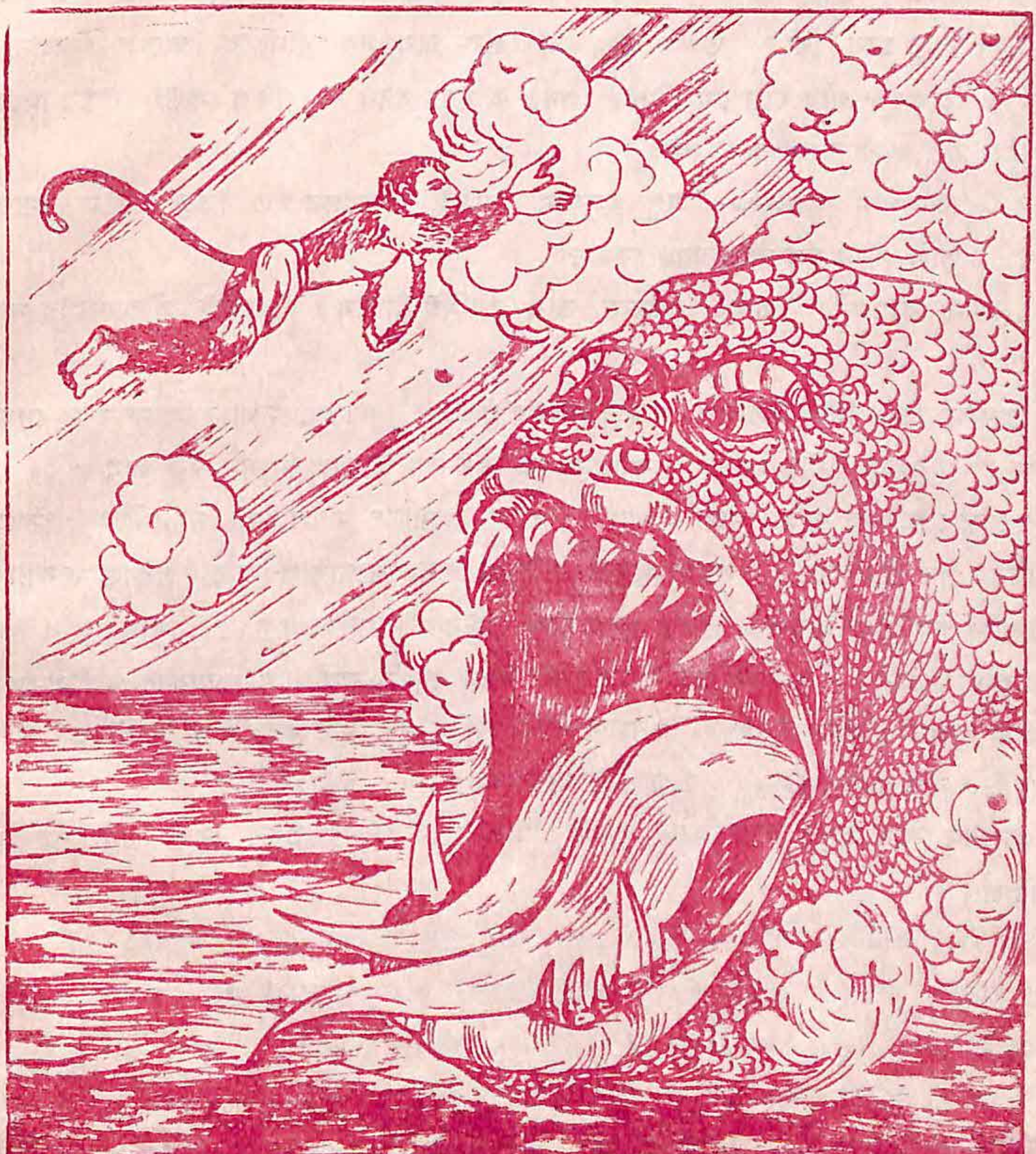
তখন সুগ্রীব তাঁর মন্ত্রী ও সেনাপতিদের ডেকে বললেন,—"যেমন করেই হোক তোমরা সীতা দেবীর খবর এনে দাও।"

মন্ত্রীরা রাজার হুকুমে বড় বড় বানরদের ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তাদের এক-একদলকে এক-একদিকে পাঠানো হ'ল। হনূমান জাম্বমান প্রভৃতি বানরেরা চললেন দক্ষিণ দিকে। রাম হনূমানের বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। বল-বিক্রমেও তিনি সকলের সেরা। তাই তাঁর হাতে নিজের আংটি দিয়ে বললেন,—"বৎস হনূমান, আমার বিশ্বাস তুমিই সীতার খবর এনে দিতে পারবে। যদি তাঁর দেখা পাও, তাহলে তাঁকে এই আংটিটি দিও। আংটি দেখলেই তোমাকে আমার লোক বলে চিনতে পারবেন।"

বানরেরা দিকে দিকে সীতার খোঁজ করে বেড়াতে লাগল। তারা সীতাকে আকাশ-পাতাল, সর্বত্র খুঁজল ; কিন্তু কোথাও তাঁর দেখা পেল না। তখন এক একদল একে একে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দিক থেকে ফিরতে লাগল, ফিরল না কেবল দক্ষিণ দিকে যারা গিয়েছিলেন তারা। এই দলেই ছিলেন হনূমান, জাম্বমান, অঙ্গদ প্রভৃতি।

দক্ষিনের দলটি ঘুরতে ঘুরতে বিন্ধ্যপর্বতের কাছে এসে বসল। দলের সকলেই বড় ক্লান্ত। এক মাস কেটে গেল, তবুও তাঁরা কেউ সীতার কোন সন্ধান করতে পারলেন না, সকলে খুব ভাবনায় পড়লেন। সেইখানে জটায়ুর বড় ভাই সম্পাতি বাস করতেন। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা এমন বিষণ্ণভাবে বসে আছে কেন? হনুমান তাঁকে সব কথা জানাতে তিনি বললেন,—"কিছুদিন আগে লঙ্কার রাজা রাবণ এখান দিয়ে একটি স্ত্রীলোককে ধরে নিয়ে

গেছে। মনে হচ্ছে তিনিই সীতা। স্ত্রীলোকটি রাম-লক্ষ্মণের নাম ধরে খুব কাঁদছিলেন।"



সুরসা নাগিণী তখন প্রকাণ্ড হাঁ করে হনুমানের পথ রোধ করলেন।

তখন বানরদের বুকে বল এল। তাঁরা সম্পাতিকে রাবণ ও লঙ্কার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

সম্পাতি বললেন,—"ঐ যে সমুদ্র দেখছ, ও হ'ল একশ' যোজন চওড়া। ওরই ওপারে রাবণ রাজার রাজ্য লঙ্কা দ্বীপ।"

সংবাদ তো পাওয়া গেল! কিন্তু এতবড় সমুদ্র পার হওয়া তো বড় সহজ কথা নয়। সেই সমুদ্র পার হবে কে? তখন জাম্বমান একে একে সব বানরকে জিজ্ঞেস করলেন,—"তোমরা এই সমুদ্র পার হয়ে কে সীতার খবর আনতে যাবে?" কিন্তু কেউই উত্তর দিলেন না, মাথা হেঁট করে সবাই বসে রইল।

তখন জাম্বমান বললেন,—"বাপু হনূমান, তুমিই আমাদের যত কিছু কঠিন কাজের ভরসা। তুমি এমন চুপ করে আছ কেন?"

হনূমান বললেন, "আচ্ছা, কাজের ভার আমিই নিলাম। আমিই সীতাদেবীর খবর এনে দোব।"

তারপর তিনি গিয়ে উঠলেন মহেন্দ্রপর্বতের চূড়ায়। কারণ, সেখানে থেকে লাফ দেওয়া সুবিধা। হনূমান শরীর ফুলিয়ে প্রকাণ্ড ক'রে "জয় রাম" ব'লে দিলেন এক লাফ।

স্বর্গের দেবতারা এলেন মজা দেখতে। তাঁরা "সুরমা" নামে এক নাগিনীকে পাঠালেন হনূমানের পথ আগলাতে। সুরসা সমুদ্রে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল-জোড়া প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে তাঁর পথ রোধ করল। কিন্তু হনূমানকে আটকায় তার সাধ্য কি? হনূমান তার ওপর দিয়ে চলে গেলেন! তারপর এল "সিংহিকা" নামে এক রাক্ষসী। সে আকাশ-পাতাল জোড়া হাঁ করে পথরোধ করে দাঁড়াল। হনূমান তখন শরীর খুব ছোট করে তার পেটে ঢুকে নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে বার হয়ে গেলেন। রাক্ষসীটা মরে গেল।

হনূমান শেষে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় গিয়ে পৌঁছলেন। তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।



সুন্দরাকাণ্ড

তখন সন্ধ্যা। তবুও হনূমান স্থির হলেন না ; শরীরকে একটি মর্কটের মতো ছোট করে সীতা দেবীকে চারধারে খোঁজ করে বেড়াতে লাগলেন! লঙ্কার প্রত্যেক বাড়িতে, প্রত্যেক বাগানে ঢুকে দেখতে লাগলেন সেখানে সীতা দেবী আছেন কিনা। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে ঢুকলেন রাবণ-রাজার বাড়ি। রাজার বাড়ি দেখে হনূমান তো অবাক! সোনার ঘর, রূপোর সিঁড়ি, স্ফটিকের দরজা, হীরে-মুক্তোর ফুল, এমনি সব সাজ-সজ্জা দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিন্তু সীতা দেবীর দেখা কোথাও পেলেন না। তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। তারপরে ঘুরতে ঘুরতে গেলেন রাবণের অশোক-বনে। সেখানে গিয়ে দেখেন, এক জায়গায়

মিটমিট করে প্রদীপ জ্বলছে, আর একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছে কয়েকটা চেড়ী।

তাই দেখে হনূমান বুঝলেন, সেই মেয়েটিই সীতা দেবী। কিন্তু তখনই তাঁর কাছে গেলেন না, একটি বড় শিশুগাছে উঠে তার পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। তারপর চেড়ীরা ঘুমিয়ে পড়লে তিনি গুনগুন স্বরে রামনাম করতে লাগলেন। রামনাম শুনে সীতা দেবী চমকে উঠলেন।

হনূমান সীতার কাছে তাঁর পরিচয় দিলেন। কিন্তু সীতা প্রথমে তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না। মনে করলেন বুঝি রাবণের চর। কিন্তু হনূমান তাঁকে রামের আংটিটি দেখাতে সীতার বিশ্বাস হ'ল যে তিনি সত্যই রামের চর। তখন দু'জনে অনেকক্ষণ দুঃখের কথাবার্তা হ'ল। সীতা কাঁদতে লাগলেন। হনূমান তাঁকে অনেক বোঝালেন। তারপর যখন সীতা দেবীর



হনূমান সীতার কাছ থেকে মাথার মণিটি চেয়ে নিচ্ছে।

কাছ থেকে হনূমান বিদায় নিলেন তখন রামের বিশ্বাসের জন্য সীতা দেবীর মাথার মণিটি চেয়ে নিলেন।

হনূমান যে কাজের ভার নিয়েছিলেন তা শেষ হ'ল। এখন কী করেন ? মনে করলেন, এবার রাবণের কিছু অনিষ্ট করে যাওয়া যাক। তিনি সুন্দর অশোক-বন ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে ফেলতে লাগলেন। প্রহরিরা বাধা দিতে গিয়ে কেউ হনূমানের হাতে মারা পড়ল, কেউ প্রাণ নিয়ে ছুটে পালালো।

রাবণের কাছে খবর গেল। রাবণ তাঁর ছেলে অক্ষকে পাঠালেন হনূমানকে শায়েস্তা করতে। অক্ষ রথে চড়ে অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধ করবেন কি ? হনূমান এক এক চড়ে অক্ষের রথের আটটি ঘোড়াকে যমালয়ে পাঠালেন। সৈন্যসামন্ত যারা ছিলেন তাদেরও শেষ করলেন। তারপর হনূমান অক্ষের পা ধরে এমন আছাড় দিলেন যে, তিনি আর উঠে দাঁড়াতে পারলেন না।

এই দুঃসংবাদ শুনে রাবণ মহা ভাবনায় পড়লেন। তখন তিনি পাঠালেন তাঁর প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিৎকে। ইন্দ্রজিৎ ছিলেন মহাবীর। তাঁর সঙ্গে দেবতারাও যুদ্ধে পারতেন না। তিনি গিয়ে হনূমানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। তিনি বাণে বাণে চারদিক অন্ধকার করে ফেললেন। কিন্তু হনূমানও যে-সে বীর ন'ন। তিনি সব বাণ ব্যর্থ করে দিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। ব্রহ্মার থেকে কারও নিস্তার নেই। ব্রহ্মাস্ত্র গিয়ে হনুমানকে বেঁধে ফেলল। কিন্তু রাক্ষসদের ভয় হ'ল, যদি হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রের বাঁধন কেটে পালিয়ে যান। তাই তারা তাড়াতাড়ি তাঁকে দড়ি দিয়ে বেশ করে জড়িয়ে বাঁধল। আর অমনি ব্রহ্মাস্ত্রের বাঁধন খুলে গেল। ব্রহ্মাস্ত্রের এই নিয়ম ছিল যে, অন্য কিছু দিয়ে বাঁধলেই ব্রহ্মাস্ত্রের বাঁধন খুলে যায়। হনূমাণ তখন ইচ্ছা করলেই সে বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তা না ক'রে মজা দেখবার জন্য চুপচাপ পড়ে থেকে মনে মনে হাসতে লাগলেন।

তখন হনূমানকে বেঁধে নিয়ে রাক্ষসেরা চলল রাবণ-রাজার সভায়। সেখানে তাঁকে নিয়ে যেতে রাবণ-রাজা জানতে চাইলেন, তিনি কে আর কি জন্য লঙ্কায় এসেছেন, অশোক-বনই বা ভেঙে-চুরে নষ্ট করলেন কেন ? হনূমান রাবণ রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি হনূমান, কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীবের মন্ত্রী, রামের সেবক। তোমার সঙ্গে দেখা করবার দরকার ছিল। তাই তোমার আশাকবন ভেঙেছি। দেখছি, তুমি একজন বড় রাজা, কিন্তু তোমার এ কেমন বুদ্ধি যে তুমি পরের স্ত্রীকে চুরি করে আনলে ? যদি ভাল চাও তো এই বেলা রামকে তাঁর স্ত্রী সীতা দেবীকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। না হলে তোমার আর রক্ষা নেই।"

হনুমানের কথা শুনে রাবণ রাগে কাঁপতে কাঁপতে হুকুম দিলেন—"এখনই ওটাকে কেটে ফেল। এত বড় কথা।

রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ বললেন, মহারাজ, এই বানর দূত মাত্র। দূত অবধ্য। একে বরং অন্য শাস্তি দিন।

রাবণ বললেন,—"আচ্ছা ? ওর লেজে আগুন ধরিয়ে দাও।"

তখন রাক্ষসেরা গাদা গাদা কাপড় এনে তাতে তেল আর ঘি দিয়ে হনূমানের লেজে জড়িয়ে বেশ মোটা করল। তারপর দিল তাতে আগুন ধরিয়ে। লেজে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। তাই দেখে রাক্ষসদের আনন্দ আর ধরে না। তারা মনে করল, এবার বানরটা পুড়ে মরবে।

সীতা দেবীর কানে এ খবর পৌঁছতে তিনি ভয়ে সারা হলেন। অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন,—"ঠাকুর, হনূমানকে রক্ষা কর।"

অগ্নিদেবের দয়াতে হনূমানের কিছুই হল না। তিনি গিয়ে উঠলেন লোকের ঘরের চালে। অমনি তাতে আগুন ধরে গেল। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়লেন আর এক চালে। তাও জ্বলে উঠল। তারপর তিনি ঘরের চালে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আর ঘরে ঘরে আগুন লেগে গেল। সোনার লঙ্কা দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। তখন রাক্ষসদের মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। তারা 'হায় হায়' করতে লাগল।

কিন্তু হনূমানের ভয় হ'ল। বুঝি অশোক-বনে সীতা দেবীর কোন অনিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তখনই আকাশ-বাণী হ'ল—"বৎস হনূমান, ভয় নেই। সীতা দেবী ভালই আছেন।"

তাই শুনে হনূমানের বড় আনন্দ হ'ল। তিনি অশোক বনে গিয়ে সীতা দেবীকে প্রণাম করলেন। সীতা দেবীও তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। হনূমান তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা উঁচু পর্বতে গিয়ে উঠলেন। তারপর আবার লাফ দিয়ে এপারে এলেন !

তাঁকে দেখে বানরদের কি আনন্দ! তিনি সকলকে লঙ্কায় যা যা ঘটেছিল সব বললেন। তারপর সকলে আনন্দে কোলাহল করতে করতে চললেন কিষ্কিন্ধ্যায় রামের কাছে। রামকে



সোনার লঙ্কা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সীতা দেবীর মণিটি ও সব খবর দিতেই তিনি আনন্দে হনুমানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু সীতার দুঃখে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।



লঙ্কাকাণ্ড

সীতা দেবীর তো সন্ধান পাওয়া গেল। এখন কী করে তাঁকে উদ্ধার করা যায়? রাম সুগ্রীবকে বললেন,—"বন্ধু, এবার সীতা উদ্ধারের উপায় কর।"

সুগ্রীব বললেন,—"বন্ধু, সেজন্য ভাবনা নেই। আমি আজই আমার যত বানর সৈন্য-সামন্ত আছে সব জড় করছি। তাদের নিয়ে লঙ্কায় গেলে সীতা দেবীকে উদ্ধার করা যাবে। সকলকে নিয়ে চলুন সমুদ্রের ধারে যাই।"

রাজা সগ্রীবের আজ্ঞা পেয়ে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে যেখানে যত বানর ছিল সব এসে জড় হ'ল। সে যে কত তার লেখা-জোখা নেই। তারপর সকলে দল বেঁধে মহা কোলাহল করতে করতে চলল সমুদ্রের দিকে। রাম, লক্ষণ, সুগ্রীব; অঙ্গদ, জাম্ববান প্রভৃতি চললেন তাদের আগে আগে। তাঁরা সমুদ্রের ধার গিয়ে পেঁাছলে, সমুদ্রের বিশাল রূপ দেখে বানরদের সব কোলাহল থেমে গেল। তারা অবাক হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওদিকে হনূমান লঙ্কায় যে সব কাণ্ড করে এসেছিলেন, তাই নিয়ে সকলের মধ্যে খুব হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। রাবণ-রাজার মহা ভাবনা হ'ল। তিনি মন্ত্রীদের ডেকে পরামর্শ করতে বললেন। মন্ত্রীদের বললেন,—"তোমরা তো জানই রাম-লক্ষণ আমার বোনকে কত অপমান করেছে, কত রাক্ষস মেরে ফেলেছে। তাই আমি রামের স্ত্রী সীতাকে ধরে এনেছি। কিন্তু রাম কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। সুগ্রীব তার বানর-সেনা নিয়ে রামকে সাহায্য করবে। কিন্তু তারা কী করে সমুদ্র পার হবে বুঝতে পারছি না। যদি কোন রকমে পারই হয়, তাহলে আমি সীতাকে কিছুতেই তাকে ফিরিয়ে দোব না। তোমরা কি বলো?

মন্ত্রীরা বললেন,—'মহারাজ যা ঠিক করেছেন তাই-ই ভালো। আপনি নিজে মহাবীর। আপনার ভাই কুম্ভকর্ণও মহাবীর। আপনার পুত্র যুবরাজ ইন্দ্রজিতের মতো বীর ত্রিভুবনে নেই। আপনাদের যুদ্ধে হারাতে পারে ত্রিভুবনে এমন বীর কোথায়? তাঁর উপর আছে আপনার হাজার হাজার সৈন-সামন্ত, কত রকমের ভয়ানক-ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র। আপনার ভয় কি?"

রাবণের ছোট ভাই কুম্ভকর্ণ ছ'মাস অঘোরে ঘুমান। তারপর একদিন জাগেন। তারপর আবার ছ'মাস ঘুমান। যেদিন জাগেন সেনি যুদ্ধে গেলে তাঁর হাতে কারো নিস্তার নেই। কিন্তু অকালে ঘুম ভাঙলে তাঁর শরীরে তেমন শক্তি থাকে না। তিনিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, বললেন,—"সীতাকে চুরি করে আনা ঠিক হয়নি। যুদ্ধ করে যদি আনা যেত, তাহলে কোন কথা ছিল না। তবে যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন লঙ্কার মান রাখতেই হবে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার।

রাবণের ছোট ভাই বিভীষণও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক। তিনি বললেন,—"মহারাজ, সীতাকে চুরি করে এনে অধর্মের কাজ করা হয়েছে। এখন তাঁকে ফিরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যায়। তাঁকে রাখলেই বিপদ হবে। রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনি কিছুতেই পারবেন না, কারণ তিনি সামান্য মানুষ ন'ন। তাঁর এক দূত এসে কী কাণ্ড করে গেল তা তো দেখলেনই! রাম লঙ্কা আক্রমণ করলে সোনার লঙ্ক ছারখারে যাবে।"

কাকার কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ বড় রেগে উঠলেন,—"আপনি খুব ভীরুর মতো কথা বলছেন। আমার বাবা ত্রিভুবন জয়ী, আমি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছি।

রামকে আমরা ভয় করব ? আপনার পরামর্শ শুনে আমরা লঙ্কার মান নষ্ট করব ? আপনার ভয় হয়ে থাকে ঘরে বসে থাকুন গিয়ে।”

বিভীষণের কথা শুনে রাবণেরও খুব রাগ হ'ল। তিনি বিভীষণকে বললেন,—“বুঝতে পেরেছি, আমাকে ছোট করাই তোমার মতলব। তোমার মতো ভাইকে ঘরে রাখা মানে তো কালসাপ পোষা। তুমি থাকলে আমার সর্বনাশ হবে। অন্য কেউ হলে এখনই কেটে ফেলতাম। তুমি এখনই দূর হও। তোমার মুখ যেন কখনো আর না দেখি। কাপুরুষ! কুলাঙ্গার।”

বিভীষণ দাদা ও ভাইপোর কথা শুনে মাথা নীচু করে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় রাবণকে বললেন—“আপনার ভালোর জন্যই বলছি, ‘ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয়’ হবেই।”

এই ব'লে তিনি সমুদ্র পার হয়ে এসে রামচন্দ্রের শরণ নিলেন।

রামও তাঁকে বন্ধুভাবে আশ্রয় দিয়ে বললেন, দুষ্ট রাবণকে বধ করে তিনি তাঁকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাবেন।

এ সব তো হ'ল, কিন্তু ভাবনা হল সমুদ্র পার হওয়া যায় কি করে ? সুগ্রীব বললেন, “বন্ধু, তারই বা ভাবনা কি ?” তাঁর সৈন্যদের মধ্যে ‘নল’ নামে একজন খুব বড় ও বুদ্ধিমান কারিগর ছিলেন। সুগ্রীব তঁাকেই সমুদ্রে সেতু বাঁধবার ভার দিলেন। নল সৈন্য-সামন্তের সাহায্যে বড় বড় গাছ-পাথর দিয়ে সমুদ্রে সেতু বেঁধে ফেললেন। তখন আর ভাবনার কিছু রইল না। রাম-লক্ষ্মণ লক্ষ লক্ষ বানর-সেনা নিয়ে সেই সেতুর উপর দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় পৌঁছলেন।

রাবণ সেই খবর পেয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তখন ‘শুক’ ও ‘সারণ’ নামে দু'জন মন্ত্রীকে পাঠালেন গোপনে রামের বল-বিক্রম ও সৈন্যের সংখ্যা কত এই সব জেনে আসতে। শুক-সারণ বানরের ছদ্মবেশে গিয়ে বানরদের সঙ্গে মিশে সব দেখে বেড়াতে লাগলেন। বানরেরা কেউ তাঁদের চিনতে পারল না। কিন্তু বিভীষণের চোখে ধূলো দেওয়া কি সহজ ? তিনি তাঁদের চিনতে পেরে বন্দী করে রামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

শুক-সারণ তখন প্রাণের ভয়ে কেঁদেই আকুল। দু'জনে রাম-লক্ষণের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের অবস্থা দেখে রামের মনে বড় দয়া হ'ল। তাঁরা দু'জন গুপ্তচর জেনেও রাম তাঁদের ক্ষমা করলেন, বললেন,—তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমরা তো

রাবণের চর মাত্র। যা দেখতে এসেছো বেশ ভাল ক'রে দেখে তোমাদের রাজাকে বলো গিয়ে।"

রামের দয়ার পরিচয় পেয়ে শুক-সারণের চোখে জল এল। তাঁরা ভক্তিভরে রামকে প্রণাম ক'রে রাজার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন,—"মহারাজ, রাম-লক্ষণ সামান্য মানুষ ন'ন। তাঁদের অসংখ্য সৈন্য। আপনি সীতাকে এখনই ফিরিয়ে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে সব বিবাদ মিটিয়ে ফেলুন।"

রাবণ সে-কথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তাঁদের দু'জনকে অনেক তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিলেন।

তারপর ভাবলেন, এক কাজ করা যাক! সীতাকে যদি বশে আনতে পারা যায় তাহলে তো যুদ্ধের সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে। এই ভেবে 'বিদ্যুজ্জিহ্ব' নামে এক রাক্ষসকে ডাকলেন। বিদ্যুজ্জিহ্ব ছিল খুব বড় যাদুকর। সে এলে রাবণ তাকে বললেন,—"তুমি রামের মাথার মতো একটা কাটা মাথা আর তার ধনুকের মতো একটা ধনুক তৈরি ক'রে নিয়ে অশোক-বনে সীতার কাছে যাও। সেখানে আমিও যাচ্ছি।

বিদ্যুজ্জিহ্ব রামের মুণ্ড ও তার ধনুকের মতো ধনুক তৈরি ক'রে অশোক বনে গিয়ে হাজির। রাবণও তার পিছন পিছন গেলেন। তিনি সেই মুণ্ড ও ধনুক সীতাকে দেখিয়ে বললেন,—"এই দেখ, রামের কাটা মাথা আর ধনুক। তাকে আমার সৈন্যরা মেরে ফেলেছে। আর তার জন্য ভেবে কি করবে? তুমি এবার আমার রাণী হও।"

সীতা রাবণের কথা শুনে কেঁদে ফেললে। তবুও রাবণকে অনেক কড়া কথা বলে তাড়িয়ে দিলেন। রাবণ চলে গেলে বিভীষণের স্ত্রী সরমা তাঁকে বললেন,—"সীতা, তুমি দুঃখ করো না। রাবণ যা বললেন সবই মিথ্যে। এই তো আমি রাম-লক্ষ্মণকে দেখে এলাম। তাঁরা ভালই আছেন।" সরমা সীতাকে বড় ভালবাসতেন। তাঁর কথা শুনে তিনি শান্ত হলেন।

এদিকে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ ও জাম্ববান প্রভৃতিকে নিয়ে উঠলেন সুবোল পর্বতের চূড়ায়। সেখান থেকে লঙ্কার সব দেখা যায়; এমন কি, রাজসভায় রাবণের সিংহাসনও চোখে পড়ে। তাঁরা দেখলেন, রাবণ সিংহাসনে বসে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন।

রাবণকে দেখেই সুগ্রীব এক লাফে সেখানে গিয়ে রাবণকে সিংহাসন থেকে টেনে নামাতেই

দু'জনে ভীষণ মল্লযদ্ধ বেধে গেল। সুগ্রীব রাবণকে কিল-চড় মেরে কাবু করে তাঁর মাথার মুকুট কেড়ে নিয়ে এসে রামকে দিলেন। রাম সুগ্রীবের বীরত্ব দেখে খুশী হলেন।

তারপর রাম অঙ্গদকে পাঠালেন রাবণের কাছে জেনে আসতে যে, তিনি সীতাকে ফিরিয়ে দেবেন কিনা। অঙ্গদের পিতা বালীর সঙ্গে রাবণের একবার যুদ্ধ হয়। বালী রাবণকে লেজে জড়িয়ে সাত সমুদ্রের জল খাইয়ে বেশ শিক্ষা দিয়েছিলেন। অঙ্গদ রাবণ-রাজার সভায় এসেই বললেন,—"আমার বাবার সঙ্গে তোমার একবার বেশ পরিচয় হয়েছিল, মনে আছে তো? আমি সেই বাপেরই বেটা, আমার নাম অঙ্গদ। আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত। তোমার কাছে এসেছি জানতে তুমি সীতা দেবীকে ফিরিয়ে দিয়ে রামচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাইবে কিনা। যদি তা না কর, তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য।"

অঙ্গদের কথা শুনে রাবণ রাগে কাঁপতে কাঁপতে হুকুম দিলেন, তাঁকে বেঁধে কারাগারে আটক করতে। অমনি চারটে রাক্ষস এল অঙ্গদকে বাঁধতে; কিন্তু বাঁধা আর হ'ল না, অঙ্গদই তাদের বগলে চেপে ধরে একটি বাড়ির ছাদে গিয়ে উঠলেন। তারপর এক আছাড়ে তাদের হাড়-গোড় ভেঙ্গে দিয়ে রামের কাছে ফিরে গেলেন।

সুগ্রীব আর অঙ্গদের কাজে রাবণ অপমানে এমন ক্ষেপে উঠলেন যে, তখনই সকলকে যুদ্ধসাজে সাজতে আদেশ দিলেন। অমনি লঙ্কার ঘরে ঘরে "সাজ সাজ" রব পড়ে গেল।

পরদিন সকালেই দু'পক্ষের সেনা পরস্পরের মুখোমুখী হতেই ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হাতী, ঘোড়া, রথ, শেল, শূল, গদা, ধনুর্বাণ এমনি আরও কত কি যে দু'পক্ষ যুদ্ধে ব্যবহার করতে লাগল কি বলবে? হাজারে হাজারে রাক্ষস সেনা মরল, শ'য়ে শ'য়ে বানর সেনা মরে স্বর্গে গেল। রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র ভেসে যেতে লাগল। রাম-লক্ষণ প্রথমদিকে যুদ্ধ করলেন না। তাঁদের সেনাপতি ও বানর-সৈন্যেরাই রাক্ষসদের যমালয়ে পাঠাতে লাগল। রাক্ষসদেরই হার হতে লাগল। তখন ইন্দ্রজিৎ এলেন যুদ্ধ করতে। তিনি মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন। তাই তাঁর সঙ্গে কেউ পারত না। ইন্দ্রজিৎ এসে মেঘের আড়াল থেকে বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। বাণে বাণে চারধার ঢেকে গেল। মেঘের আড়ালে থাকায় রাম-লক্ষণ তাঁকে দেখতে পেলেন না। কাজেই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধেও সুবিধা করতে পারলেন না।

ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে নাগপাশ বাণ ছাড়লেন। অমনি হাজার হাজার সাপ সাঁ সোঁ করে এসে দু'ভাইকে বেঁধে ফেলল। তাঁরা মড়ার মতো পড়ে রইলেন। তাই দেখে বানরেরা হাহাকার করে কাঁদতে লাগল। ইন্দ্রজিৎও ফিরে গিয়ে রাজাকে বললেন,—"আর ভাবনার কিছু নেই। রাম লক্ষ্মণের দফা রফা করে এসেছি।"

তাই শুনে রাবণ-রাজার ভারি আহ্লাদ হ'ল। এদিকে বিভীষণ কিন্তু জানতেন যে, রাম-লক্ষ্মণের মৃত্যু হয় নি, তাঁরা মূর্ছা গেছেন মাত্র। তিনি কাছে গিয়ে বললেন,—"গরুড়কে স্মরণ



ইন্দ্রজিতের নাগপাশ বাণে হাজার হাজার সাপ এসো রাম-লক্ষ্মণকে বেঁধে ফেললো।

করুণ।" রাম গরুড়কে স্মরণ করা মাত্রই পাখার ভয়ংকর শব্দ করতে করতে গরুড় আকাশ পথে উড়ে এলেন। তাঁর পাখার শব্দ শুনেই সাপগুলো রাম লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিয়ে কে কোথায় প্রাণ নিয়ে পালাল। রাম-লক্ষ্মণ উঠে বসলেন এবং রাম বিভীষণকে আলিঙ্গন করে বললেন,—"আপনি সত্যই বন্ধু। বিপদে আপনার জন্যই প্রাণরক্ষা পেল।"

রাম-লক্ষ্মণকে সুস্থ হতে দেখে বানরদের আবার কোলাহল ও লম্ফ ঝম্ফ শুরু হল। সে শব্দ রাবণের কানে যেতে তিনি তো মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। খবর নিয়ে জানতে পারলেন, রাম-লক্ষ্মণ মরেন নি। তাই শুনে তাঁর খুব দুঃখ হ'ল।

তখন রাবণ বড় বড় সেনাপতিদের একে একে রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। তাদের এক একজনের যেমন নাম তেমনি শক্তি। একজনের নাম ধূম্রাক্ষ, একজনের নাম বজ্রদংষ্ট্র, একজনের নাম প্রহস্ত, এমনি আরও কত জনের কত নাম! কিন্তু রাম-লক্ষ্মণকে হারানোর সাধ্য কারোই হ'ল না। তাদের কেউ মরলেন বানরদের কিল-চড় ঘুষি খেয়ে, কেউ মরলেন তাদের হাতে এক এক আছাড়ে! তাতে রাক্ষস সেনাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল, আর বানরেরা আনন্দে ভীষণ কোলাহল করতে লাগল।

রাবণ তখন নিরুপায় হয়ে নিজে এলেন যুদ্ধ করতে। লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। লক্ষণ তাতে একরকম হেরেই গেলেন। তখন রাম এগিয়ে গেলেন ধনুর্বাণ নিয়ে।



রাম স্মরণ করতেই গরুড় ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে আকাশ পথে উড়ে এলেন।

রাম-রাবণে ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল। দু'জনেই মহাবীর, কিন্তু বাণে বাণে রাম রাবণকে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেললেন। শেষে রাবণ পালাবার পথ খুঁজতে লাগলেন! তাঁর অবস্থা দেখে রাম বললেন,—"রাবণ, বুঝতে পারছি তুমি যুদ্ধ করতে করতে বড় ক্লান্ত হয়েছ। ক্লান্ত যোদ্ধার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করি না। তুমি আজ ঘরে যাও। কাল এসে যুদ্ধ করো।"

রাবণের মুখ দিয়ে আর কথা বের হ'ল না। তিনি চুপ করে ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁর এবার বড় ভয় হ'ল। কুম্ভকর্ণ ছাড়া রাম-লক্ষ্মণকে হারায় এমন সাধ্য কারও নেই। কুম্ভকর্ণের কাছে লোক পাঠালেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণের তখন ঘুমোবার সময়। তিনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, আর তাঁর নাক ডাকছেন। তার আওয়াজই বা কি!

যাই হোক, হাজার হাজার রাক্ষস তাঁকে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সে ঘুম কি সহজে ভাঙে? ব্রহ্মার শাপে তার এমন দশা হয়েছিল। রাক্ষসরা তাঁর কানের কাছে হাজার

হাজার ঢাক-ঢোল-কাঁসি বাজতে লাগল ; তাঁর নাকে-কানে হাজার হাজার কলসী জল ঢালতে লাগল ; তাঁকে খোন্তা, শাবল, কুড়ল দিয়ে খোঁচা দিতে লাগল। তবুও কুম্ভকর্ন অঘোরে ঘুমোতে লাগলেন। শেষে রাক্ষসরা পাল পাল হাতী এনে তাঁর পিঠে তুলে দিল। হাতীরা চলে ফিরে বেড়াতে লাগল। তখন কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙলো। তিনি উঠে বসেই এমন হাঁক ছাড়লেন যে, সারা লঙ্কা কেঁপে উঠল। এই সব ব্যাপার থেকেই বুঝতে পারছ তিনি কী ভয়ংকর দেখতে ছিলেন ! যেন একটা লোহার বিরাট পাহাড় !

তাঁকে জাগতে দেখেই রাবণ-রাজা তাঁর সামনে গিয়ে বললেন,—"ভাই এবার বুঝি লঙ্কার মান যায়। তুমি না রক্ষা করলে রাক্ষসকুল ধ্বংস হয়ে যাবে।"

কুম্ভকর্ণ "আচ্ছা" বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং ভীষণ এক হাঁক ছেড়ে যুদ্ধ করতে চললেন। তাঁকে দেখেই বানরেরা ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তাঁর নিঃশ্বাসে কত বানর উড়ে গেল, পায়ের চাপে কত বানর পিষে গেল। তিনি হাতের কাছে যতগুলো বানর পেলেন সব-গুলোকে দু'হাতে ধরে টপাপপ্ মুখে পুরে গিলে ফেললেন। অঙ্গদ, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা বড় বড় গাছ-পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। কিন্তু সে সবের একটাও তাঁর কিছুই করতে পারল না। তিনি ধারাল শূল দিয়ে গাছগুলো কেটে ফেললেন। পাথরগুলো তার গায়ে লেগে গুঁড়ো হয়ে গেল। বানরদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিল। তখন লক্ষ্মণ এলেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। লক্ষণকে দেখে কুম্ভকর্ণ টিটকারি দিয়ে বললেন,—"বাপু, কেন মরবে ? তোমার দাদাকে পাঠিয়ে দাও গে।"

তাই শুনে লক্ষণের খুব রাগ হ'ল। তিনি খুব চোখা চোখা বাণ ছাড়তে লাগলেন। কিন্তু মহাবীর কুম্ভকর্ণ সে-সব বান কেটে-কুটে ভেঙে-চুরে ফেলতে লাগলেন। দূর থেকে তাই দেখে রাম ধনুর্বাণ নিয়ে ছুটে এলেন। রামকে দেখে কুম্ভকর্ণ ভীষণ রেগে হুংকার দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন ! তাঁকে শেল, শূল, গদা প্রভৃতি নানারকমের অস্ত্র ছুঁড়ে মারতে লাগলেন ! কিন্তু রাম হাসতে হাসতে সে-সব অস্ত্র বাণে বাণে কেটে ফেললেন। তারপর এমন এক বাণ ছাড়লেন যে, তাতে কুম্ভকর্ণের একখানি হাত ও একখানি পা কাটা গেল। তবুও কি কুম্ভকর্ণ কাবু হলেন ? তিনি এক পায়ে ভর দিয়ে এলেন রামকে গিলে খেতে। তখন রাম ইন্দ্র-বাণে দিলেন তাঁর মাথা কেটে। কুম্ভকর্ণ মারা গেলেন। তখন এলেন তাঁর দুই ছেলে—কুম্ভ ও নিকুম্ভ রামের সঙ্গে লড়াই করতে। তাঁরাও ছিলেন মহাবীর। কিন্তু হলে কি হবে ? রামের হাতে তাঁরাও মরলেন। রাক্ষসরা হাহাকার করতে লাগল। আর, বানরদের উল্লাস দেখে কে ?

এই সময় ইন্দ্রজিৎ আবার এলেন রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এবারেও তিনি মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতে লাগলেন, তাই রাম-লক্ষণ তাঁকে দেখতে পেলেন না। যুদ্ধ করতে করতে ইন্দ্রজিৎ এমন এক বাণ মারলেন যে, রাম-লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। বানরেরা সকলে মনে করল, তাঁরা দু'ভাই মারা গেছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি সকলে হায় হায় করে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু জাম্বমান রাম-লক্ষ্মণের দেহ পরীক্ষা করে বললেন,—"তোমরা অস্থির হয়ো না। এঁদের দেহে প্রাণ আছে। বাপু হনুমান, স্থির হও। এখনই ওষুধ আনতে যাও। সকাল হবার আগেই যদি ওষুধ আনতে পার, তাহলে এঁরা সুস্থ হয়ে



হনুমান গাছসুদ্ধ পর্বত মাথায় করে নিয়ে আসছেন।

উঠবেন। হিমালয় পর্বত পার হয়েই ঋষভ পর্বত। তারপর আছে কৈলাস পর্বত। ঋষভ আর কৈলাস পর্বতের মাঝখানে আছে 'বিশল্যকরণী', মৃতসঞ্জীবনী, 'সুবর্ণকরণী' আর 'সন্ধানী'। এই চার রকমের ওষুধ। এখনই এগুলি আনতে যাও।"

হনুমানকে বলা মাত্র তিনি তিন লাফে হিমালয় পার হয়ে ওষধি পর্বতে গিয়ে পড়লেন। দেখলেন, সেখানে নানারকমের গাছ রয়েছে। কিন্তু কোনগুলি যে ঐ সব ওষুধের গাছ তা

তিনি চিনতে পারলেন না। তখন আর কি করেন। গাছসুদ্ধ পর্বতটাকেই উপড়ে তুলে মাথায় নিয়ে এক লাফে লঙ্কায় ফিরে এলেন। জাম্ববান পর্বত থেকে গাছগুলি চিনে রাম-লক্ষ্মণের নাকের কাছে ধরতেই তার গন্ধে তাঁরা উঠে বসলেন। তাই দেখে বানরেরা আনন্দে চীৎকার করতে লাগল।

তারপর যা যুদ্ধ হ'ল তা বড় ভয়ানক। তাতে হাজার হাজার রাক্ষস ও রাক্ষসদের বড় বড় বীর, বড় বড় সেনাপতি রাম-লক্ষনের বাণে মারা গেল। বীরবাহু, ভস্মলোচন, মহোদর, মকরাক্ষ, নরান্তক প্রভৃতি বীরেরা যুদ্ধ করতে এসে আর ফিরে গেলেন না। রাবণ তখন বিষম দুশ্চিন্তায় পড়লেন, কি যে করবেন ভেবে পেলেন না।

ইন্দ্রজিৎ বললেন,—"কোন ভাবনা নেই। রাম-লক্ষ্মণকে বধ করার আমি এক উপায় ঠিক করেছি।" তিনি মায়াময় মারীচকে দিয়ে একটি নকল সীতা তৈরী করালেন। তারপর সেই নকল সীতাকে যুদ্ধস্থলে নিয়ে গিয়ে বানরদের সামনে কেটে ফেলতেই তাই দেখে হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরেরা হা-হুতাশ করে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু কেউই বুঝতে পারলেন না যে, নকল সীতা। ইন্দ্রজিৎ সেই অবসরে গিয়ে "নিকুম্ভিলা" যজ্ঞ করতে বসলেন। এই যজ্ঞ করেই তিনি মেঘের আড়ালে গিয়ে ওঠেন। তখন কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। তিনি সেখান থেকে যুদ্ধ করে শত্রুকে পরাস্ত করেন। তখন সেই উদ্দেশ্যেই তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

কিন্তু বিভীষণ আসল ব্যাপারটা জানতে পারলেন তিনি সকলকে শান্ত করলেন এবং ইন্দ্রজিৎ সবে গিয়ে যজ্ঞ শুরু করেছেন এমন সময় লক্ষ্মণ ও হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হলেন। প্রহরীরা কেউ কেউ হনুমানকে দেখেই পালাল। যারা সাহস করে লড়াই করতে এগিয়ে এল, হনূমানের হাতে তাদের সকলেরই মৃত্যু হ'ল। আর বিভীষণ গিয়ে ঢুকলেন ইন্দ্রজিতের যজ্ঞশালায়। বিভীষণ ভীষণ শূল হাতে দরজায় পাহারা রইলেন, যাতে ইন্দ্রজিৎ তাঁর অস্ত্রশালায় গিয়ে অস্ত্র না আনতে পারেন। আর লক্ষণ ঢুকলেন ঘরের ভিতর। ইন্দ্রজিৎ প্রথমে তাঁকে দেখে মনে করলেন কোন দেবতা। শেষে তাঁর ভুল ভাঙলো। কিন্তু তখন তিনি নিরস্ত্র, তবুও কোশা ছুঁড়ে মারলেন। লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে সেখানে পড়ে গেলেন। ইন্দ্রজিৎ তখনই ছুটলেন নিজের অস্ত্রশালার দিকে। কিন্তু বিভীষণ দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে যেতে দিলেন না। দু'জনে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি হ'ল।

সেই অবসরে লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরে এল। তখন ইন্দ্রজিৎ এক রকম নিরস্ত্র অবস্থায় লক্ষ্মণের সঙ্গে সেই যজ্ঞশালার মধ্যেই যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি হাতের কাছে যা পান

তাই-ই ছুঁড়ে লক্ষ্মণকে মারেন। লক্ষ্মণও বাণে বাণে তা কেটে ফেললেন। শেষে ইন্দ্র-বাণে ইন্দ্রজিতের মাথা কেটে ফেললেন। লঙ্কার সব চেয়ে বড় বীর, রাবণের প্রিয়তম পুত্র এইভাবে মারা গেলেন। লঙ্কা বীরশূন্য হ'ল। সে খবরে বানরেরা আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। রামের কাছে লক্ষ্মণ ফিরে গেলে তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। আর লঙ্কার ঘরে ঘরে উঠল কান্নার রোল। রাবণ দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কার ভরসায় আজ তিনি যুদ্ধ করবেন? তখন হঠাৎ তিনি শোকে ও রাগে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, সীতাকে কেটে ফেলতে উদ্যত হলেন। তাঁর জন্যই তো সব ছারখারে গেল।

তখন মন্ত্রীরা বললেন,—"মহারাজ, এক অসহায় নারীকে বধ করা কি আপনার মতো বীরের শোভা পায়? রাম-লক্ষ্মণই আপনার শত্রু। তাদেরই বধ করুন।"

রাবণ মন্ত্রীদের কথায় নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তখন তিনি নিজেই যুদ্ধ-সাজে



রাবণের শক্তিশেল বাণে লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

সেজে গেলেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণের পাশে বিভীষণকে দেখেই তাঁর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে এক ভীষণ শূল ছুঁড়ে মারলেন। লক্ষ্মণও

তখনই সে শূল কেটে ফেললেন। তখন রাবণ লক্ষণকে লক্ষ করে শক্তিশেল ছুঁড়লেন। আবার লক্ষণ তা কাটতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না। শূল তাঁর বুকে এসে লাগল। তিনি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। রাম তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু হনূমান আবার ওষুধ এনে দিলেন। ওষুধের গুণে লক্ষণ সুস্থ হয়ে বসলেন।

এবার রাম গেলেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। অমনি ভীষণ যুদ্ধ বেধে উঠল। রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখতে দেব, যক্ষ, রক্ষ ও অসুরেরা এলেন। তারা আকাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। দু'জনেই মহাবীর। রাবণ রামকে লক্ষ্য করে ভীষণ শূল, শেল ছাড়তে লাগলেন। রামও সে সব বাণে বাণে কেটে ফেললেন। এমনি করে বহুক্ষণ দু'জনের ভীষণ যুদ্ধ চলল। কেউ কাউকে হারাতে পারেন না। একবার মনে হয় রাবণ জিতবেন, আবার মনে হয় রামই জিতবেন। শেষে রাম ব্রহ্মাস্ত্র হাতে নিতেই রাবণ বুঝলেন, এবার তাঁর নিশ্চিত মৃত্যু। ব্রহ্মাস্ত্র থেকে কারোই নিস্তার নেই। সে অস্ত্রের মুখ দিয়ে আগুন বার হতে লাগল। রাম রাবণকে লক্ষ্য করে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। রাবণ তা এড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর সাধ্য কি ? অস্ত্র গিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেলল। রাবণ মারা গেলেন। আকাশে দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি করতে লাগলেন। আর লঙ্কার রাক্ষসীরাও হাহাকার করে কাঁদতে লাগল। বিভীষণও কেঁদে আকুল হলেন, কারণ বড় ভাই রাবণের বংশে বাতি দিতে আর কেউ রইল না। তিনি নিজের দোষে সবংশে মারা গেলেন।

হনূমান অশোক-বনে সীতার কাছে গিয়ে রাবণের মৃত্যু সংবাদ দিলে সীতা প্রথমে কোন কথাই বলতে পারলেন না। কিন্তু পরে তাঁর মুখে কথা ফুটল। তিনি বললেন,—"বাছা হনুমান, তুমি আমায় আজ সুখবর দিলে। কিন্তু আমার কাছে এমন কিছুই নেই যে তোমায় পুরস্কার দিই।"

হনূমান বললেন,—"মা, তোমাকে যে এই দুঃখ থেকে উদ্ধার করতে পারলাম, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আমার জীবন আজ সার্থক হ'ল।"

হনূমানের কথা শুনে সীতা বড়ই আনন্দিত হ'ল। তিনি মনে মনে কত সুখেরই কল্পনা করতে লাগলেন। শেষে রাম-লক্ষণের কাছে এলেন, কিন্তু রামের পায়ে প্রণাম করতে গিয়ে তার মুখের ভাব দেখে সীতার বুক কেঁপে উঠল। তারপর রামের মুখে সীতা যা শুনলেন, তাতে মনে হল, কেন তাঁর মৃত্যু হ'ল না ? হায় রে! এই জন্যই কি এত দুঃখ, এত অত্যাচার সহ্য করে এতদিন অশোক-বনে তিনি প্রাণধারণ করেছিলেন ?

রাম বললেন,—"সীতা, তুমি আমার স্ত্রী! তোমাকে রাবণের কবল থেকে উদ্ধার করে

আমি তোমার সম্মান রক্ষা করলাম। এতদিন তুমি দুষ্ট রাবণের আশ্রয়ে ছিলে। সেখানে কিভাবে ছিলে জানি না। এ অবস্থায় আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারি না। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

চিরদুঃখিনী সীতা একথা শুনে কি স্থির থাকতে পারেন? রামের কথায় আজ তাঁর বুক যেন ফেটে গেল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—"দেবর লক্ষণ, আমি আর সইতে পারি না। তুমি আগুন জ্বাল। আমি তাতে ঝাঁপ দিয়ে এ প্রাণ বিসর্জন দিই।"

লক্ষণও কাঁদতে কাঁদতে আগুন জ্বাললেন। সীতা রামের পায়ের ধুলো নিয়ে সেই আগুনে



স্বয়ং অগ্নিদেব সীতাকে সঙ্গে নিয়ে আগুনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঝাঁপ দিলেন। তাই দেখে হনূমান, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা 'হায় 'হায়' করতে লাগল। কিন্তু রাম স্থির হয়ে সেই আগুনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর তাঁর দু'চোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগল।

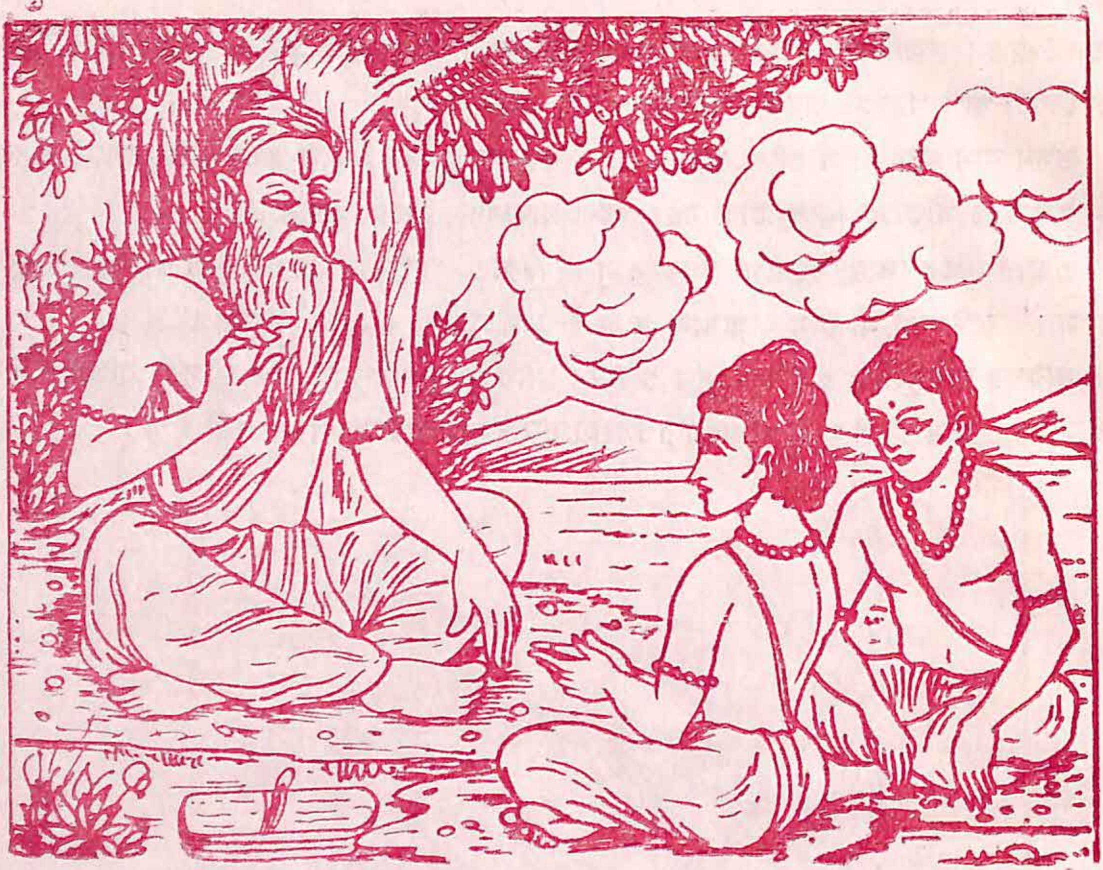
কিন্তু সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, স্বয়ং অগ্নিদেব সীতাকে নিয়ে আগুনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। সীতার গায়ে আগুনের এতটুকু দাগও নেই। তিনি সোনার প্রতিমার

মতো উজ্জ্বল। অগ্নিদেব বললেন,—"এমন সতী-লক্ষী মেয়ে আর নেই! সীতার দেহ মনে এক ফোঁটা পাপ থাকলে আমি তাকে গ্রাস করে ফেলতাম।"

তখন রাম আনন্দে সীতাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসিয়ে রাম লক্ষণ ও সীতাকে নিয়ে চৌদ্দ বছর পরে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন।

তাঁদের ফিরে পেয়ে সকলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। ভরত এসে রামের পা ধুয়ে দিলেন। কৌশল্যা মা রাম লক্ষণকে বুকে জড়িয়ে বুকের জ্বালা জুড়োলেন।

তারপর কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মুনি শুভদিন দেখে খুব ধুমধামের সঙ্গে রামের রাজ্যাভিষেক করলেন। রাম রাজা হয়ে অযোধ্যার সিংহাসনে বসলে প্রজারা পরম সুখী হ'ল।



উত্তরাকাণ্ড

রাম সুখে রাজত্ব করছেন। তাঁর রাজ্যে প্রজারা সুখী। রাজবাড়ির সকলেই সুখী। কিন্তু হায়! সীতার দুঃখের বুঝি শেষ নেই।

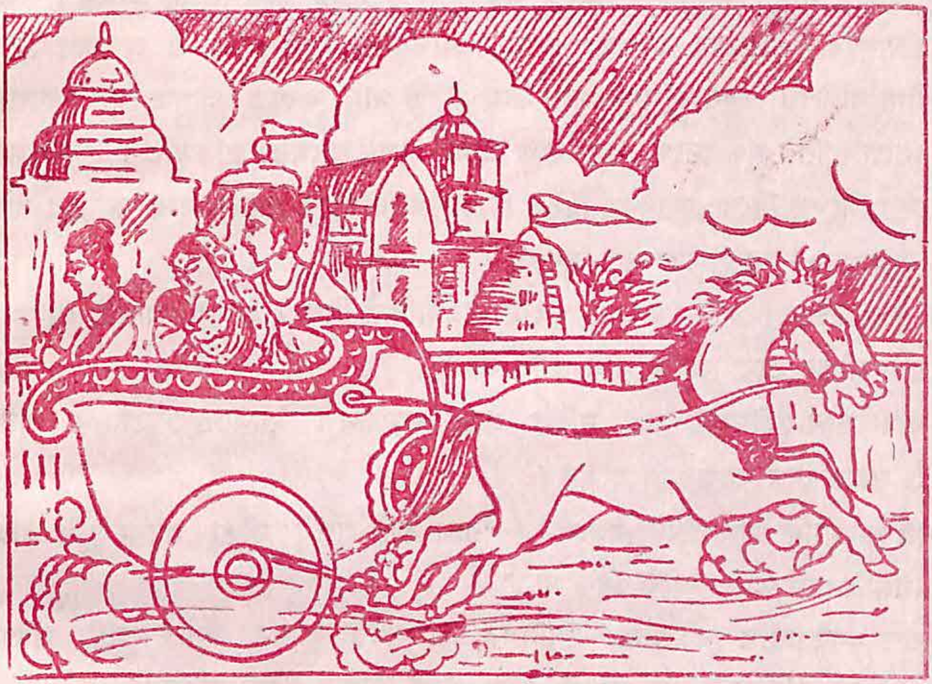
একদিন রামচন্দ্র শুনতে পেলেন, প্রজাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছে, তিনি সীতাকে গ্রহণ করে বিবেচকের মতো কাজ করেন নি। সীতা এতকাল পরের ঘরে ছিলেন। সেখানে কেমন অবস্থায় ছিলেন, তা তো কারো জানা নেই। এমনি নানা কথা তারা বলাবলি করতে লাগল।

সীতার মতো সতী-লক্ষী মেয়েকেও লোকে সন্দেহ করছে শুনে রামের বুক ভেঙ্গে গেল। ভাবতে ভাবতে তিনি পাষাণের মতো হয়ে গেলেন। কিন্তু প্রজাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি

সীতাকে বনে রেখে আসতে লক্ষণকে আদেশ দিলেন ! কিন্তু লক্ষণ প্রথমে সে আদেশ পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন।

শেষে রাম তাঁকে বুঝিয়ে বলাতে তিনি সীতাকে নিয়ে তমসা নদীর তীরে বাল্মীকি মুনির তপোবনে রেখে কাঁদতে কাঁদতে অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

সীতার কান্নায় বনের পশু-পাখিরাও কাঁদতে লাগল। মহর্ষি বাল্মীকি বড় আদরে, বড়



রামের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রম তপোবনে নিয়ে যাচ্ছেন।

স্নেহে সীতাকে নিজের কুটীরে ঠাঁই দিয়ে নিজের মেয়ের মতো সযত্নে পালন করতে লাগলেন।

আশ্রমে আসবার কিছুদিন পরে সীতার দুই জমজ পুত্র হ'ল। কি তাদের রূপ ! যেন চাঁদের টুকরো ! মহর্ষি তাদের নাম রাখলেন—লব ও কুশ। ছেলে দু'টিকে পেয়ে সীতা একটু শান্তি পেলেন।

লব-কুশ কিছু বড় হলে বাল্মীকি মুনি তাদের নানা শাস্ত্র, ধনুর্বিদ্যা ও গান শেখালেন। ছেলে দু'টি রূপে গুণে অদ্বিতীয় হয়ে উঠল। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন ; তারা তাই সুমধুর সুরে গান গেয়ে বেড়ায়। শুনে সকলে মগ্ধ হয়।

ওদিকে রামচন্দ্র প্রজাপালন করেন। প্রজারা তাঁর রাজ্যে বড় সুখী। কিন্তু রামচন্দ্রের মনে সুখ নেই। তিনি যে সোনার সীতাকে বনবাস দিয়েছেন। তাঁর দুঃখ কে বুঝবে? এইভাবে বারো বছর কাটল। এমন সময় একদিন বশিষ্ট মুনি তাঁকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে উপদেশ দিলেন। রামচন্দ্র রাজী হয়ে যজ্ঞের আয়োজন করলেন। অযোধ্যানগর মুনি-ঋষি, ব্রাহ্মণ-পন্ডিত, রাজা-সামন্তে ভরে গেল। মহা ধুমধাম হতে লাগল।

যজ্ঞ শুরু হ'ল। বাল্মীকি মুনিও লব-কুশকে নিয়ে রাজসভায় এলেন। লব-কুশের মাথায় জটা, পরনে গেরুয়া কাপড়, গলায় যজ্ঞোপবীত, মুখে তেজ ও অপরূপ শ্রী। তারা দু'ভাই বীণা বাজিয়ে এমন সুমধুর সুরে রাম-চরিত গান করতে লাগল যে, সকলেরর চোখে জল। ছেলে দু'টির মুখ দেখে মনে হতে লাগল যেন রামের প্রতিমূর্তি। সকলেই অবাক হয়ে তাদের মুখের দিকে তাকিরে রইল। কৌশল্যা-মাতা তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন,—"বাছা তোমরা কে?"

লব-কুশ উত্তর দিল,—"আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য। তাঁরই আশ্রয়ে থাকি আমাদের মায়ের নাম সীতা, তবে বাবার নাম জানি না।"

সে কথা শুনে কৌশল্যা মাতা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। রামচন্দ্রও তাদের পরিচয় পেয়ে আনন্দে ও দুঃখে যেন আত্মহারা হলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে বললেন,—"রাম সতী-লক্ষ্মী সীতা মাকে তুমি আবার গ্রহণ কর। বিনা দোষে তাঁকে কষ্ট দিও না।"

রামচন্দ্র কাতরস্বরে বললেন,—"মুনিবর, প্রজাদের সুখের জন্যই আমি সীতাকে ত্যাগ করেছি। তারা যদি সুখী হয়, তবেই আমি তাঁকে আবার গ্রহণ করব।"

রাজার আদেশে সুমন্ত্র সারথি তখনই রথ নিয়ে গেলেন বাল্মীকির তপোবনে। সীতা রথে চড়ে অযোধ্যায় এলেন।

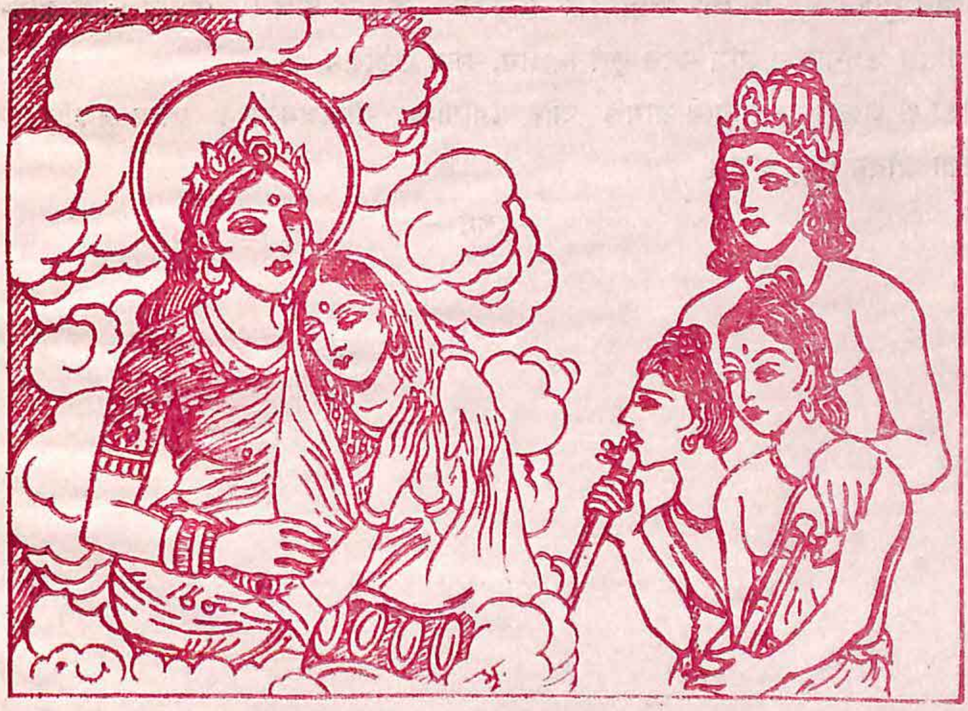
সীতা রাজসভায় আসতে বাল্মীকি মুনি সভার সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন,— আপনারা যে যেখানে আছেন সকলে দেখুন, ইনিই মা জানকী। ত্রিভুবনে এমন সতী-লক্ষ্মী মেয়ে আর নেই। এঁর দেহ মনে বিন্দুমাত্র পাপ নেই। আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে আমার সমস্ত তপস্যার ফল যেন নষ্ট হয়ে যায়। আপনারা সন্তুষ্ট হলে রাম এমন মেয়েকে গ্রহণ করে সুখী হতে পারেন।"

মুনির কথা শুনে অনেকেই সুখী হলেন। অনেকেরই চোখে আনন্দের ধারা বইতে লাগল। তাঁরা সম্মতি দিলেন কিন্তু দুষ্ট লোকেরা চুপ করে বসে রইল। তাই থেকে বোঝা গেল

এখনও কেউ কেউ সীতাকে সন্দেহ করে। তাই দেখে রামের বুক ভেঙে যেতে লাগল। আর চির দুঃখিনী সীতা সে অপমান সইতে পারলেন না। তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল। তিনি হাত জোড় করে কম্পিতস্বরে বললেন,—"মা বসমতি, তুমি দ্বিধা হও। আমি তোমার কোলে আশ্রয় নিয়ে সকল জ্বালা দূর করি।"

অমনি সেখানকার মাটি দু'ভাগ হয়ে গেল। সেই ফাটল পথে সোনার সিংহাসনে উঠে এলেন বসুমতি। তিনি এসেই তাঁর আদরের কন্যা সীতা দেবীকে কোলে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হলেন।

সভাস্থ সকলে তাই দেখে হাহাকার করে উঠলেন। রাম "হায় সীতা" বলে মূর্ছিত হয়ে



মা বসুমতী সীতাকে কোলে তুলে নিলেন।

পড়লেন। লব-কুশ মাটিতে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এই শোকের মধ্যেই রাম কোন রকমে যজ্ঞ শেষ করলেন।

সীতাকে পেয়েও আবার হারিয়ে রামের দুঃখের সীমা রইল না। এইভাবে কিছুদিন কাটল। অবশেষে একদিন কালপুরুষ রামের সঙ্গে দেখা করে বললেন,—"মহারাজ, আপনার

সঙ্গে গোপনে আমার কিছু কথা আছে। কথা বলবার সময় কেউ কাছে আসতে পারবে না। যদি কেউ আসে, তবে তাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে হবে।"

রাম এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে লক্ষ্মণকে পাহারায় রেখে কালপুরুষকে নিয়ে ঘরে গেলেন। ঠিক এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন দুর্বাসা মুনি। তিনি বড় বদরাগী। তিনি এসেই রামের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। লক্ষ্মণ তাঁকে বোঝালেন সব কথা। তবুও মুনি অটল, রামের সঙ্গে তাঁকে এখনি দেখা করতেই হবে। মুনি বললেন, "রামের কাছে নিয়ে চলো, নইলে আমি শাপ দেব, সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

মুনির একথা শুনে লক্ষ্মণ বিশেষ ভয় পেলেন। তখন আর অন্য কোন উপায় না দেখে লক্ষ্মণ খবর দিতে ঘরে ঢুকলেন।

রামের বুক ফেটে গেলেও লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করতে হ'ল। বিদায় নিয়ে লক্ষ্মণ সরযূ নদীতে গিয়ে ভগবানের নাম করে ডুব দিলেন, আর উঠলেন না।

সীতা ও লক্ষ্মণকে হারিয়ে রামও আর বেশিদিন বাঁচলেন না। শেষে একদিন তাঁরও দুঃখ-ভরা জীবন শেষ হ'ল।

—শেষ—

রঞ্জন প্রকাশনের

ছোটদের বই মানেই
মনের জানলা দিয়ে
এক ঝলক খুশির বাতাস
সে বাতাস ছোটদের মন মাতিয়ে
ছুঁয়ে যায় বড়দেরও।
রূপকথা, অ্যাডভেনচার, জীবনী,
শিকার-কাহিনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান,
ভূতের গল্প, হাসির গল্প, খেলা,
ক্যুইজ, ক্লাসিকস, ছড়া,
সব কিছুই ছড়িয়ে আছে
এই স্বপ্নে ভরা বইয়ের মেলায়।
আর সে বইয়ের পাতায় পাতায়
মন ভরানো রঙীন ছবির আলপনা,
হাতে নিলেই খুশির রঙে
মন রঙীন হয়ে ওঠে ॥

রঞ্জন প্রকাশন
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩